হরভনের নওলা

তাস-রহস্য

হরতনের নওলা

তাস-রহস্য

শরচ্চন্দ্র সরকার-সঙ্কলিত

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

CALCUTTA
THE BENGAL MEDICAL LIBRARY
201, CORNWALLIS STREET
1908

Published by Paul Brothers & Co.
7 Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.
ILLUSTRATED BY P. G. DASS.
PRINTED BY N. C. PAL, "INDIAN PATRIOT PRESS,"
70, BARANASI GHOSE'S STREET, CALCUTTA.

1908.

এই পুস্তক মূল্যবান্ স্বদেশী দীর্ঘস্থায়ী ক্লাসিক এণ্টিক-উভ কাগজে ছাপা হইল।

প্রকাশক।

উৎসর্গ।

পরমারাধনীয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুজ

মহোদয় শ্রীচরণেষু ;—

মহাত্মন্!

বিগত বড় দিনের অবকাশে তীর্থপর্য্যটনে নির্গত হইয়া আপনার আশ্রমে (দেওঘরে) উপস্থিত হইয়া আপনার সদ্‌গুণে বিমোহিত হইয়াছি। যাঁহার (পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের) উপদেশে "গোয়েন্দা-কাহিনী" সাহিত্য-সেবকগণের হস্তে ন্যস্ত হইতেছে, তিনি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই প্রতিদ্বন্দ্বীও এবার আপনাকে নির্ব্বাচন করিয়া আপনার নামেই এই পুস্তক উৎসর্গীকৃত করিতে পরামর্শ দিলেন। ইহাও আপনার অল্প মাহাত্ম্যের কথা নহে।

বাঙ্গালা-সাহিত্যক্ষেত্র আপনার "বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা" "ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা" "সেকাল আর একাল" "হিন্দু-কালেজের ইতিবৃত্ত" "বিবিধ প্রবন্ধ" ইত্যাদি পুস্তক উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে শোভমান। আমরা তৎসমস্ত পাঠে কতই উপকৃত।

এই সকল কারণে অদ্য বঙ্গভাষার অন্যতম প্রকৃত হিতৈষীর কোমল করকমলে এই গ্রন্থ মহাগ্রহে সম্প্রদান করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিলাম। ইতি—

কলিকাতা,
৭ই আষাঢ়, ১৩০২।

বিনয়াবনত—
শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

নিবেদন

দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে এই উপন্যাসখানি ভূতপূর্ব্ব "গোয়েন্দা-কাহিনী" পর্য্যায় "খুন না আত্মহত্যা" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল; এবং পাঠকবর্গের আগ্রহাতিশয্যবশতঃ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমুদয় পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া যায়; এবং নানাকারণে তাহার পর ইহা এ পর্য্যন্ত পুনর্মুদ্রিত হয় নাই; কিন্তু এরূপ সর্ব্বজনাদৃত পুস্তক আর অপ্রকাশিত রাখা বিধেয় নহে, তাহাই আমরা ইহা সুচারুরূপে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া পুরাতন নামের পরিবর্ত্তে "হরতনের নওলা" নূতন নামে প্রকাশিত করিলাম; এখন পাঠক মহোদয়গণের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে ইহার এই পুনর্জন্ম সার্থক হয়।

পরিশেষে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষমতাশালী প্রবীণ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার এই সহানুভূতির জন্য আমরা তাঁহার নিকটে চির-বাধিত রহিলাম।

কলিকাতা,
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫।

প্রকাশক।

প্রথম খণ্ড

হরতনের নওলা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেসন আদালত (দায়রা)

বহুবাজারের যজ্ঞেশ্বর মিত্র কলিকাতার একজন নামজাদা লোক। তিনি ধনী ও বিদ্বান্। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহার বেশ সুখ্যাতি আছে; কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া যথেষ্ট যশোলাভ করিয়াছেন। আজ তাঁহার মোকদ্দমা।

গত ২৬শে আষাঢ় তারিখে তিনি নিজের স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। সেই পর্য্যন্ত তিনি কারাগারে আছেন। অনেকেই তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার দ্বারা এ ভীষণ হত্যা-কাণ্ড ঘটিতে পারে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিতেছেন। করোণার্স কোর্ট এবং পুলিস কোর্টের বিচারে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, বিষ-প্রয়োগে তাঁহার স্ত্রীকে হত্যা করা হইয়াছে। ঘটনাচক্রে যজ্ঞেশ্বরের বিরুদ্ধে এমন সব প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে যে, তিনিই যে প্রকৃত হত্যাকারী, সে বিষয়ে আর কাহারও কোন সন্দেহ নাই।

যজ্ঞেশ্বর পুলিসের মোকদ্দমায় "আমি নির্দ্দোষ," এ ছাড়া আর একটি কথাও বলেন নাই। উকীল কৌন্সিলীর জেরায় অন্য কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। সেসন আদালতে দুইদিন মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, আজ তৃতীয় দিবস। অদ্যকার মোকদ্দমায় সম্ভবতঃ বিচারপতি রায় দিবেন।

বিচারগৃহ লোকে-লোকারণ্য! সকলেরই ইচ্ছা, যজ্ঞেশ্বর বাবু নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস পান।

যজ্ঞেশ্বরের পিতা খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং যজ্ঞেশ্বর বাবুও খৃষ্টান। তাহার আচার-ব্যবহার সমস্তই সাহেবের ন্যায়। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় তিনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যজ্ঞেশ্বর একজন নেটীব খৃষ্টীয়ানের দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত ডাক নাম হেমাঙ্গিনী এবং পূরা নাম এলিস্ হেমাঙ্গিনী কেথারিন্। আমরা সুধু হেমাঙ্গিনীই বলিব।

সহরের সকল সংবাদপত্রেই এই হত্যাকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংরাজ মহলে ও বাঙ্গালী মহলে সকল স্থানেই এই ঘটনা লইয়া একটা তুমূল আন্দোলন চলিতেছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে অশীতি-পর বৃদ্ধ ব্যক্তিও যজ্ঞেশ্বর মিত্রের নাম শুনিয়াছেন। বিশেষ প্রমাণ-প্রয়োগসত্ত্বেও অনেকের ধারণা যে, তিনি নির্ব্বিঘ্নে কারামুক্ত হইবেন।

ব্যারিষ্টার নিকলাস্ সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বিচারপতিকে যথা-রীতি সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "বোধ হয়, আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, এই বন্দী মোকদ্দমার প্রথম দিন কৌন্সিলী নিযুক্ত করেন নাই। দ্বিতীয় দিনে বন্ধুবান্ধবগণের একান্ত অনুরোধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে এই মোকদ্দমা চালাইবার ভারার্পণ করেন। আমার ধারণা ছিল, এ

বিষয়ে তাঁহার মতের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না; কিন্তু আজ সহসা তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইতেছি। এখন ইনি কোনক্রমেই আমার দ্বারা মোকদ্দমা চালাইতে প্রস্তুত নহেন। আমার কার্য্যদক্ষতার উপরে বন্দীর যে কোন প্রকার সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহা নহে। ইনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, নিজেই নিজের মোকদ্দমা চালাইবেন; কাহাকেও ইঁহার সাপক্ষে কথা কহিতে দিবেন না। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, ইঁহাকে আমি নির্দ্দোষ প্রমাণিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিব; কিন্তু যখন দেখিতেছি, ইনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত নহেন, তখন কাজেকাজেই আমাকে আদালতের শরণ লইতে হইতেছে——”

নিকলাস্ সাহেবের সমস্ত কথা সমাপ্ত হইতে-না-হইতেই বন্দী যজ্ঞেশ্বর বাবু নিজে বিচারপতিকে সম্বোধন করিলেন।

বিচারপতি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “স্থির হও, তোমার সমস্ত কথা তোমার ব্যারিষ্টার নিকলাস্ সাহেবের মুখ হইতে আমি শুনিব। তোমার কথা কহিবার কোন আবশ্যকতা নাই।”

বন্দী। বিচারপতি! আজ আমার ব্যারিষ্টার কেহ নাই। আমি আমার নিজের কথা নিজে বলিব। আমার হইয়া কথা কহিবার অন্য লোকের কোন অধিকার নাই। আমি কাহাকেও সে ক্ষমতা প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি।

বিচারপতি। বন্দী! আমায় বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে, তুমি যাহা স্থির করিয়াছ, তাহা অন্যায় ও বিপজ্জনক।

বন্দী। আমার নিজের ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা আমার আছে। কিসে আমার ভাল, কিসে আমার মন্দ হইকে, তাহা আমি অন্য লোক অপেক্ষা ভাল বুঝি। আমার ভাল-মন্দ আমারই উপরে নির্ভর করে।

বিচারপতি। সকল সময়ে তাহা ঘটে না। তুমি একজন সদ্বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। বোধ হয়, তুমি একবাক্যে স্বীকার করিবে, যে বিষয় লইয়া যে চর্চ্চা করে, সে সেই বিষয়ে অন্য লোক অপেক্ষা অধিক দক্ষতা ও বিজ্ঞতা লাভ করে। আদালতের উকীল কৌন্সিলীরা আইন-কানুন লইয়াই জীবনাতিপাত করিয়া থাকেন। মোকদ্দমার বিষয়ে তাঁহারা নিশ্চয়ই তোমাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী। যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারিলে তুমি নির্দ্দোষ প্রমাণীকৃত হইয়া কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, যে উপায় হয় ত তুমি কখন কল্পনায় আনিতে পারিবে না, তোমার ব্যারিষ্টার হয় ত অনায়াসে সেই সকল সূত্র বাহির করিয়া তোমায় রক্ষা করিতে পারিবেন। হয় ত তুমি আইনেব তর্কে, সাক্ষীর জবানবন্দীর কোন প্রকার গলদে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারে এবং নিকলাস্ সাহেবের বুদ্ধিমত্ত ও বিচক্ষণতায় পরিত্রাণ পাইতে পার। আমার কথা বুঝিয়াছ ?

বন্দী। ধর্ম্মাবতার ! আমি আপনার সমস্ত কথাই বুঝিতে পারিতেছি এবং আপনার এই প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য আপনাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি ; কিন্তু যদি আইনের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারে ও ব্যারিষ্টারের তর্ক শক্তির জোরে আমায় রক্ষা পাইতে হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাবাস আমি শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করি। নিজ উদারতা গুণে আপনি আমাকে জ্ঞানী, বিচক্ষণ সদ্বিদ্বান্ প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন ; অতএব আপনার কথার উপরেই নির্ভর করিয়া আমি সম্পূর্ণ সাহসের সহিত নিজে নিজের মোকদ্দমা চালাইব। তা ছাড়া আইন-কানুনও আমার কিছু কিছু জানা আছে। নিকলাস্ সাহেব যে সকল কথা বলিয়াছেন, সে সমস্তই সত্য এবং বাস্তবিক ; আমি অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিতই তাঁহাকে আমার

সাপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলাম। নিকলাস্ সাহেবের উপরে আমার বিশ্বাস অটুট এবং যদি আমার কোন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত লোককে আমি কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিতাম না। ধর্ম্মাবতার! আমি আমার নিজের ভাল-মন্দ বেশ বুঝিতে পারি। আশা করি, আপনি আমার ইচ্ছায় বাধা দিবেন না। আমি নিজেই নিজের মোকদ্দমা পরিচালন করিব।

বন্দীর এই প্রকার কথায় কাজেকাজেই বিচারপতি বাধ্য হইয়া মোকদ্দমা আরম্ভ করিলেন।

প্রথমেই খোদাবক্স কোচ্‌ম্যানের ডাক হইল। কোম্পানীর তরফের ব্যারিষ্টার উঠিয়া তাহাকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন।

খোদাবক্স কোচ্‌ম্যানের জবানবন্দী শুনিবার জন্য শত শত লোক উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার সাক্ষীতে এমন কথা প্রকাশ হইতে পারে যে, তাহাতে হয় যজ্ঞেশ্বর বাবুর মুক্তিলাভ, না হয় তাঁহার সর্ব্বনাশ হইতে পারে, এই কথা উকীল কৌন্সিলীমাত্রেই ভাবিতেছিলেন।

খোদাবক্স দেখিতে বেশ বলিষ্ঠ, বয়ঃক্রম ত্রিশ বত্রিশ, মুখে খুব ব্যগ্রতার ভাব, অন্তরে প্রভুর ইষ্ট চিন্তায় চিন্তিত। গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ব্যারিষ্টার উঠিয়া খোদাবক্সকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, সে নির্ভয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার উত্তর প্রদান করিতে লাগিল। আমরা প্রশ্নগুলি বাদ দিয়া কেবল উত্তরগুলি সংক্ষেপে এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খোদাবক্সের এজেহার

"আমার নাম খোদাবক্স। আমি প্রায় তিন বৎসর যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকটে চাকরী করিতেছি। প্রায় প্রতিদিনই আমি আমার মনিবের গাড়ী হাঁকাই। তাঁহার গলার শব্দ না পাইলেও দূরে বা অন্ধকারে আমি তাঁহাকে অনায়াসেই চিনিতে পারি। দিনে বা রাত্রে সকল সময়েই আমি তাঁহাকে লইয়া বেড়াইয়াছি। অন্ধকার রাত্রে দূর হইতে তাঁহাকে আসিতে দেখিলেও আমি চিনিতে পারিতাম। আমার চোখের কোন দোষ নাই। ২৫শে আষাঢ় তারিখের দিন ও রাত্রির সমস্ত কথাই আমার মনে আছে। সেদিনকার মত খাটুনি আমার অদৃষ্টে আর একদিনও ঘটে নাই। বেলা এগারটা হইতে রাত্রি সাড়ে বারটা পর্য্যন্ত, আমি সেদিন গাড়ী হাঁকাইয়াছি। সে গাড়ীতে আমার মনিব ছিলেন। সন্ধ্যা অবধি তিনি একাই ছিলেন। সমস্ত দিন যে ক্রমাগতই আমাকে গাড়ী চালাইতে হইয়াছিল, তাহা নয়। মাঝে মাঝে বিশ্রাম ছিল। আমার মনিব অন্য কোন দিন ঘোড়াকে এত কষ্ট দেন নাই, তিনি বড় দয়ালু। ঘোড়াকে তিনি পূর্ব্বে কখনও এত খাটান নাই। বেলা এগারটার সময় আমার প্রভু গাড়ীতে উঠেন। তখন তাঁহাকে আমি বিশেষ চিন্তাযুক্ত দেখিয়াছিলাম। তিনি প্রথমে আমায় ভবানীপুরে যাইতে বলেন। কোন্ বাড়ীতে তিনি যাইবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'চৌরঙ্গীর বড় রাস্তা দিয়া চল, কোথায় থামিতে হইবে, তাহা আমি পরে বলিব।'

"যেখানে তিনি আমায় গাড়ী থামাইতে বলিলেন, সেখানে কোন লোকের বাড়ী ছিল না, কোন বাড়ীর দরজার সম্মুখে তিনি আমায় থামাইতে বলেন নাই ; রাস্তার মাঝখানে গাড়ী থামাইয়া হাঁটিয়া তিনি একটা গলির ভিতরে চলিয়া যান। আমায় ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া রাখিতে বলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহাকে আমি বড় চিন্তাযুক্ত বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম। এবারেও তিনি খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, 'খোদাবক্স ! যে রাস্তা দিয়া আসিয়াছিলে, সেই রাস্তা দিয়া ফিরিয়া চল। বেশি জোরে গাড়ী হাঁকিও না। আস্তে আস্তে চল।' ধর্ম্মতলার মোড় ছাড়িয়া খানিকটা দূরে আসিলে তিনি আবার আর একটা গলির মোড়ে গাড়ী থামাইতে বলেন। সেইখানে নামিয়া পড়িয়া একটা গলির ভিতরে চলিয়া যান। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কতক্ষণের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। তিনি উত্তর করেন, ঘণ্টাখানেক দেরী হইবে।

"এই রকম কথায় আর তাঁহার সেদিনকার ভাবগতিক দেখিয়া আমি গাড়ী ঘোড়া লইয়া গড়ের মাঠের দিকে চলিয়া যাই। সেখানে গিয়া ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেও একটু বিশ্রাম করি। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়াও আমি সেই গলির মোড়ে আমার প্রভুকে দেখিতে পাই নাই। যখন তিনি ফিরিয়া আসেন, তখন প্রায় রাত্রি হইয়া আসিয়াছে। সে সময়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়িতেছিল। আমার মনিব ফিরিয়া আসিয়া আমায় গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে যাইতে বলেন। সেখানে পৌঁছিলে গাড়ী হইতে নামিয়া তিনি আমায় বলেন, 'খোদাবক্স ! এখানে আমার কত দেরী হইবে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। হয় ত দু-চার মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারি, কি দুই-এক ঘণ্টা থাকিতেও পারি। তুমি গাড়ী নিয়া এইখানেই থাকিবে।'

"প্রায় রাত্রি সাড়ে নয়টার সময়ে তিনি হোটেল হইতে বাহির হইয়া আসেন। তাঁহার সঙ্গে আর একজন লোকও ছিল। সে লোকটির কত বয়স, বৃদ্ধ কি যুবা, দাড়ী ছিল কি না ছিল, এ সব আমি কিছুই দেখি নাই। আমি কেবল আমার প্রভুর প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। আমার প্রভু ইংরাজী ধরণের পোষাক পরিতেন। চাল-চলনও সাহেবের মত। সেদিন তিনি যে লম্বা আলষ্টার কোটটি পরিয়াছিলেন, সে রকম রঙের কোট বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে লোকটির সঙ্গে আমার প্রভু হোটেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে তিনি কিছুদূর এগিয়ে যান। তাহার পর সে লোকটি তাঁহার কাছে বিদায় লইয়া হোটেলের দক্ষিণ দিকের গলির মধ্যে প্রবেশ করে, আর আমার মনিব ফিরিয়া আসিয়া গাড়ীতে চড়েন। যখন তাঁহারা দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন, তখন আমার বোধ হইয়াছিল, যেন আমার প্রভু সেই লোকটিকে কি বুঝাইতেছিলেন; আর সে উত্তেজিত হইয়া রুক্ষভাবে তাঁহার কথার জবাব করিতেছিল।

"বাবু গাড়ীতে উঠিয়া আমায় পটলডাঙ্গা গোলদীঘীর সম্মুখে গাড়ী লইয়া যাইতে বলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে তিনি গোলদীঘীর সাম্নে নামিয়া পড়িলেন, তখনই গোলদীঘীর ভিতরে ঢুকিয়া খুব দ্রুতপদে কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহা আর আমি দেখিতে পাইলাম না। আমি গাড়ী লইয়া সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দশ-পনের মিনিট পরে আমার প্রভু একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, আর নিজে গাড়ীর দরজা খুলিয়া সযত্নে তাঁহাকে সেই গাড়ীর ভিতরে উঠাইয়া, তাহার পরে নিজে গাড়ীতে উঠিলেন। যে স্ত্রীলোকটি তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরণে চওড়া কালাপেড়ে কাপড়, গায়ে জামা, পায়ে মোজা ও জুতা ছিল।

"সে সময়ে রাস্তায় বা গোলদীঘীর ভিতরে লোকজন বড়-একটা কেহই ছিল না। গাড়ীতে উঠিয়া আমার প্রভু আমায় ঠন্‌ঠনে যাইতে বলিলেন। সেখানে তাঁহার একটি ভাড়াটিয়া বাড়ী ছিল। একজন বাঙ্গালী বাবু এই বাড়ীটিতে ইংরাজী ধরণে একটি হোটেল খুলিয়াছিলেন। শুনেছি, এই হোটেলে ছাগ ও ভেড়ার মাংস ছাড়া অন্য কোন মাংস রন্ধন হইত না। হোটেলটি খুব ভাল চলিত। যে লোকটি এই ব্যবসায় খুলিয়াছিলেন, তাঁহার বেশ দু পয়সা লাভ হইতেছিল। ইংরাজী ধরণে রন্ধন করিতে শিখাইবার জন্য এই হোটেলে একজন মুসলমান ছিল। সে পূর্ব্বে কোন ইংরাজের হোটেলে চাকরী করিত। তাহার সহিত আমার বেশ আলাপ ছিল। তাহার বাবুর জমীদারের কোচ্‌ম্যান বলিয়া সে আমায় বড় খাতির-যত্ন করিত। আহারাদিও কখন কখনও ফাঁকি দিয়া আমার চলিয়া যাইত।

"আমার প্রভু এখানে প্রায় আসিতেন। তাঁহার জন্য একটি স্বতন্ত্র ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি যখন আসিতেন, তখন সেই ঘরেই বসিতেন, এবং ইচ্ছা হইলে খাওয়া-দাওয়াও করিতেন। সেদিন তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে লইয়া সেই ঘরে গিয়া বসিয়াছিলেন। আমিও সুযোগ বুঝিয়া আমার সেই জাতভায়ের সঙ্গে দেখা করিলাম। সেদিন হোটেলে লোকজন কিছু কম হওয়াতে অনেক জিনিষ পড়িয়াছিল। হোটেলের মালিক বাবুটিও তখন বাড়ী চলিয়া গিয়াছিলেন। কাজেকাজেই নির্ব্বিঘ্নে আমার জাতভাই আমায় পরিতোষপূর্ব্বক মাংসাদি আহার করাইল। আমার প্রভু সে সময়ে উপরে কি করিতেছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে আমার সন্দেহ হইয়াছিল বটে যে, এ ব্যাপারের ভিতরে নিশ্চয়ই কোন কু-অভিসন্ধি আছে। এই ঘটনার পূর্ব্বে আমি আমার প্রভুকে কখন এরূপভাবে দেখি নাই। আর কখনও তাঁহার চরিত্রের

উপরে আমার সন্দেহ হয় নাই, যখন তিনি হোটেল হইতে বাহিরে আসিলেন, তখন প্রায় রাত্রি বারটা হইবে।”

যজ্ঞেশ্বর বাবুর কোচম্যান এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইল। গভর্ণমেণ্টের পক্ষীয় ব্যারিষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, “যখন তিনি হোটেল হইতে বাহিরে আসিলেন, তখনও কি তাঁহার সঙ্গে সেই স্ত্রীলোকটি ছিলেন ?”

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। সে সময়ও কি বৃষ্টি পড়িতেছিল ?

উত্তর। হাঁ, সে সময় খুব জোরে বৃষ্টি হইতেছিল।

প্রশ্ন। তোমার প্রভুকে কি গাড়ীতে উঠিবার সময়ে বড় ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে দেখিয়াছিলে ?

উত্তর। হাঁ, তিনি খুব ব্যস্ত-সমস্ত ভাবেই গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। বোধ হয়, সে সময়ে খুব বৃষ্টি পড়িতেছিল বলিয়াই তিনি ওরূপভাবে তাড়াতাড়ি আসিয়াছিলেন।

প্রশ্ন। প্রথমে কে গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন ?

উত্তর। প্রথমে সেই স্ত্রীলোকটি, তাহার পর আমার প্রভু।

প্রশ্ন। তোমার প্রভু কি, মদ খান ?

উত্তর। কখন কখন খান।

প্রশ্ন। যখন তিনি গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি মদের ঝোঁকে ছিলেন, এরূপ বোধ হয় কি ?

উত্তর। তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না।

প্রশ্ন। তিনি গাড়ীতে উঠিয়া কি বলিলেন ?

উত্তর। বলিলেন, ‘ঘর চল।’

প্রশ্ন। তাঁহার গলার স্বর তখন কেমন ?

উত্তর। স্বর ভারী—মাতালের মত।

প্রশ্ন। তখনও কি তাঁহার সেই লম্বা কোট পরা ছিল ?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। তুমি বাড়ীতে চলিয়া গেলে—তাহার পর কি হইল ?

উত্তর। আমার প্রভু প্রথমে গাড়ী হইতে নামিলেন, তাহার পর হাত ধরিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে নামাইলেন এবং দুইজনেই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

প্রশ্ন। যখন তিনি গাড়ী হইতে নামিয়াছিলেন, তখন কি তিনি স্থিরভাবে ছিলেন, না মদের ঝোঁকে তাঁহার পা টলিতেছিল ?

উত্তর। তা আমি ঠিক বলিতে পারি না। তবে এ কথা বলিতে পারি, তিনি সে সময়েও বড় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর দিকে গিয়াছিলেন।

প্রশ্ন। তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বারংবার তোমার প্রভুর দিকে চাহিয়া দেখিতেছ কেন ?

উত্তর। কে জানে কেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার মনিবের মত মনিব আর আমি পাইব না। আমার ইচ্ছা নয় যে, উনি কোন রকমে আমার কথায় কষ্ট পান।

প্রশ্ন। তোমার প্রভু গাড়ী হইতে নামিয়া যাইবার সময়ে তোমায় কিছু বলিয়াছিলেন ?

উত্তর। না, আমি সেদিনকার মত আমার কাজ শেষ হইয়াছে, ভাবিয়া গাড়ী খুলিয়া দিয়া আস্তাবলে ঘোড়া লইয়া যাই।

প্রশ্ন। যত দিন তুমি চাকরী করিতেছ, তাহার মধ্যে সেদিন ছাড়া পূর্ব্বে আর কখনও তোমার প্রভুকে এত রাত্রে এ রকম ভাবে কোন স্ত্রীলোককে লইয়া ঘুরিতে বা নিজের বাড়ীতে আসিতে দেখিয়াছ ?

উত্তর। না, কখনও না।

প্রশ্ন। তাহা হইলে ঐদিনকার যতগুলি ঘটনা, সমস্তই তোমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতেছিল ?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। তুমি আর কখনও কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে অধিক রাত্রিতে তোমার প্রভুকে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছ ?

উত্তর। কখন কখন তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার সঙ্গে থিয়েটার দেখিতে গিয়া অধিক রাত্রে তাঁহার সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়াছেন, দেখিয়াছি বটে ; কিন্তু অন্য কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রভুকে কখনও দেখি নাই।

প্রশ্ন। পঁচিশে আষাঢ় তারিখের রাত্রে যে স্ত্রীলোকটি ঠন্‌ঠনের হোটেল হইতে তোমার প্রভুর সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তিনি তোমার প্রভুপত্নী নহেন, এ কথা তুমি শপথ করে বলিতে পার ?

উত্তর। আজ্ঞে হাঁ।

এই পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়া গভর্ণমেণ্ট-তরফের ব্যারিষ্টার নিজের আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বিচারপতি একবার বন্দী যজ্ঞেশ্বর বাবুর দিকে চাহিলেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু সে চাহনীর উদ্দেশ্য বুঝিয়া গোদাবক্স কোচ্‌ম্যানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জেরা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহা এত সংক্ষিপ্ত যে, আদালত সুদ্ধ লোকে তৎশ্রবণে বিস্মিত হইলেন। সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, যখন যজ্ঞেশ্বর বাবু সকলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া নিজের স্কন্ধে মোকদ্দমার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই নিজে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ, এ কথা সকলেই জানিতেন ; কিন্তু আদালতে মোকদ্দমা চালাইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল কি না, এ কথা কেহই জানিতেন না। এমন কি অনেকের মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, নিজ বুদ্ধির দোষে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খোদাবক্সের এজেহার—ক্রমশঃ

বন্দী যজ্ঞেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোদাবক্স! তুমি বলিতেছ, প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে আমি ঠন্‌ঠনের হোটেল হইতে বাহির হইয়াছিলাম। আমার সঙ্গে একজন স্ত্রীলোক ছিলেন, আর সে সময়ে খুব বৃষ্টি হইতেছিল। এ সব কথা কি ঠিক? তুমি শপথ করিয়া বলিতেছ?

খোদাবক্স। আজ্ঞে হাঁ।

বন্দী। আমি তোমায় ডাকিয়াছিলাম?

খোদাবক্স। না, আপনাকে হোটেল হইতে বাহিরে আসিতে দেখিয়া আমি তখনই গাড়ী লইয়া এগিয়ে যাই। আপনার ডাকিবার দরকার হয় নাই, আমি নিকটেই ছিলাম।

বন্দী। তুমি বলিতেছ যে, যখন আমি এবং সেই স্ত্রীলোক গাড়ীতে উঠি, সেই সময়ে আমি তোমায় বলিয়াছিলাম, 'ঘর চল।' আর তখন আমার কণ্ঠস্বর 'ভারী ও মাতালের মত' এই রকম তোমার বোধ হইয়াছিল?

খোদাবক্স। আজ্ঞে হাঁ, হুজুর।

বন্দী। আচ্ছা, সে কণ্ঠস্বর আমার কি অন্য লোকের, তুমি তাই কি একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছিলে? তোমার কি মনে হয় যে, আমিই 'ঘর চল' বলিয়াছিলাম?

খোদাবক্স। আজ্ঞে হাঁ, আমার একবারও মনে হয় নাই যে, সে আওয়াজ অন্য লোকের।

বন্দী। আমি তখনও আমার সেই অলষ্টার কোট পরিয়াছিলাম ?

খোদাবক্স। আজ্ঞে হাঁ।

বন্দী। তুমি বরাবর আমাদের উভয়কে বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলে, আর আমি সেই স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলাম, এ সব তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলে ?

খোদাবক্স। আজ্ঞে হাঁ।

বন্দী। তখনও আমার গায়ে সেই কোট ছিল ?

খোদাবক্স। আজ্ঞে হাঁ।

বন্দী। আমি তোমার দিকে একবারও মুখ ফিরাইয়াছিলাম কি ? আমার মুখ তুমি তখন একবারও দেখিতে পাইয়াছিলে ?

খোদাবক্স। না।

বন্দী। যদি আমি তখন তোমার দিকে মুখ ফিরাইতাম, তাহা হইলে সেই অন্ধকারে তুমি আমার চেহারা তখন ঠিক দেখিতে পাইতে কি ?

খোদাবক্স। না, তাহা পাইতাম না।

বন্দী। তোমায় আর আমার বড় কিছু জিজ্ঞাস্য নাই। তুমি এতদিন বড় বিশ্বাস ও যোগ্যতার সহিত আমার কাজ করিয়া আসিয়াছ, তোমায় একটি শেষ কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি বিচারপতির সম্মুখে যে সমস্ত কথা বলিলে, তাহার একটিও মিথ্যা বল নাই ? যেগুলি তুমি যথার্থ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলে এবং স্বকর্ণে শুনিয়াছিলে, সেইগুলিই বলেছ —কেমন ?

খোদাবক্স। আজ্ঞে হাঁ, হুজুর !

বন্দী আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। গভর্ণমেণ্টের তরফের ব্যারিষ্টার পুনরায় জেরা করিতে লাগিলেন।

প্রশ্ন। তুমি কোন নেশা কর কি ?

উত্তর। কখন কখন তাড়ী খাই বটে, অন্য নেশা কিছু করি না; কিন্তু সেদিন তাড়ীও খাই নাই।

প্রশ্ন। তোমার প্রভুকে তুমি প্রতিদিনই দেখিতে পাইতে, তোমার চোখের কোন দোষ নাই, এবং অন্ধকারে দেখিলেও তুমি দূর হইতে তোমার মনিবকে চিনিতে পার; সেদিন তুমি তাঁহাকে ভুল দেখিয়াছিলে কি না—অন্ততঃ তোমার কোন ভুল হওয়া সম্ভব কি না?

উত্তর। আল্লা জানেন, ভুল হইলেও হইতে পারে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার ভুল হয় নাই।

গভর্ণমেণ্ট পক্ষীয় ব্যারিষ্টার খোদাবক্সকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষীর ডাক হইল, তাহার নাম হরিহর কর্ম্মকার। সে ঠনঠনে হোটেলের একজন ভৃত্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হরিহরের এজেহার

হরিহর কর্ম্মকার পূর্ব্বোক্ত ঠনঠনিয়া হোটেলে উপস্থিত ভদ্রলোকগণকে মাংসাদি যোগাইত। পূর্ব্বে সে হরিহর মুখোপাধ্যায় নামে পৈতাধারী ব্রাহ্মণ সাজিয়া কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে সূপকার ছিল। এখন সে এই হোটেলে চাকরী গ্রহণ করিয়াছে। মাংসাদি রন্ধন তাহার ভাল আসিত না বলিয়া সে মুসলমান সূপকারের কাছে তাহা শিক্ষা করিতেছিল। যে বাবুটি হোটেলের মালিক, হরিহর তাঁহার স্বদেশীয় লোক। কার্জেকাজেই তাঁহার কাছে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেওয়ার কোন উপায় ছিল না।

হরিহর খুব চালাক চতুর লোক। কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোক বা কাপ্তেন বাবু ধরণের কোন অল্প বয়স্ক যুবা আসিলেই হোটেলের মালিক হরিহরকে সেই ঘরে আহারীয় যোগাইতে দিতেন। হরিহর সেই সকল লোকের সহিত এমনভাবে কথাবার্ত্তা কহিত যে, তাঁহারা একবার আসিলে আরও পাঁচবার আসিতে বাধ্য হইতেন। এক কথায় হোটেলের খরিদ্দার ভদ্রলোকমাত্রেই হরিহরের যত্নে অভ্যর্থনায় ও চাহিবার পূর্ব্বেই আবশ্যক বস্তু হাতে হাতে পাওয়ায় এত সন্তুষ্ট হইতেন যে, অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবু সাহেবী হোটেল পরিত্যাগ করিয়া এই বাঙ্গালী হোটেলে খাতা খুলিয়াছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই হোটেলটি বেশ জাঁকাল ধরণের হইয়া উঠিয়াছিল।

জমীদারের সম্মানের জন্য যজ্ঞেশ্বর বাবুর স্বতন্ত্র ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি যখন আসিতেন, তখনই হরিহর যাইয়া তাঁহার আহারীয় যোগাইত এবং মিষ্ট ও সন্তোষজনক কথায় তাঁহাকে পুলকিত করিতে চেষ্টা করিত। হোটেলের স্বত্বাধিকারী বাবুটি যেদিন উপস্থিত থাকিতেন, সেদিন তিনিও আসিয়া যোগ দিতেন। এই দুইজনে পড়িয়া এমন চেষ্টা করিতেন যে, বাড়ীখানির মাসিক ভাড়া যাহাতে যজ্ঞেশ্বর বাবু কিছু না পান—মাংসাহারেই শোধ যায়। এমন কি কখন কখন মাসিক ভাড়ার উপরে যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকটে হোটেলের স্বত্বাধিকারীর পাওনা হইত। হরিহর কর্ম্মকারের এজেহার নিম্নে প্রকটিত হইল;—

"পঁচিশে আষাঢ় তারিখে রাত্রি এগারটার সময়ে যজ্ঞেশ্বর বাবু একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আমাদের হোটেলে আসিয়াছিলেন, তাহা আমার বেশ স্মরণ আছে। আমি তাঁহাকে মাংসাদি আহারীয় ও বরফ লিমনেড স্যাম্পেন ইত্যাদি পানীয় আনিয়া দিয়াছিলাম।

"যজ্ঞেশ্বর বাবু যে স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া নেটীব খৃষ্টীয়ান বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। তাঁহার চালচলনে গণিকা বলিয়া আমার বোধ হয় নাই। মাংসের নানাবিধ খাদ্য প্রভৃতি যজ্ঞেশ্বর বাবুর হুকুম মত আমি আনিয়া দিয়াছিলাম। সকল রকমই একটু একটু যজ্ঞেশ্বর বাবু আহার করিয়াছিলেন।

"স্ত্রীলোকটি এক গেলাস বরফ-লিমনেড ছাড়া আর কিছুই পান বা আহার করেন নাই। তাঁহারা উভয়ে কি একটা বিষয় লইয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত কথা কহিতেছিলেন। আমি যতবার তাঁহাদের আহার্য্য লইয়া তাঁহাদের ঘরের ভিতরে গিয়াছিলাম, ততবারই তাঁহাদের কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহাদের কথাবার্ত্তার আমি কিছুই শুনি নাই, আর সে গুপ্তকথা শুনিবার আমার ইচ্ছাও ছিল না।

"আর মনিবের যত অধিক মাল কাটতি হয়, সেইদিকেই আমার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আমি 'আর কিছু চাই' জিজ্ঞাসা করিলেই যজ্ঞেশ্বর বাবু একটার পর আর একটা জিনিষ আনিতে হুকুম করিতেছিলেন বটে, কিন্তু আহার অতি অল্পই করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে পাছে তিনি অসন্তুষ্ট হন, এইজন্য যতবার আমি সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, ততবারই কেবল যজ্ঞেশ্বর বাবুর দিকে চাহিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলাম। তাঁহারা যখন চলিয়া গিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহাদিগকে দেখি নাই। সে সময়ে অন্য আর একটি ঘরে আমি খাদ্য যোগাইতে গিয়াছিলাম।

"আমাদের হোটেলে ইংরাজ, বাঙ্গালী দুই জাতিই আসিত। তবে বাঙ্গালীর ভিড় কিছু বেশী হইত। দুই-চারিজন ইংরাজ আমাদের বাঁধা খদ্দের ছিলেন; তাঁহারা সাহেবী হোটেলের চর্ব্বি দিয়া রান্নার পরিবর্ত্তে আমাদের বাঙ্গালী প্রণালীর ঘৃত ও নানাবিধ মশলাসংযুক্ত রন্ধন বড় ভালবাসিতেন।

"সাহেবদের সঙ্গে বড় বেশী কথাবার্ত্তা কহিবার আবশ্যক হইত না। তাঁহাদের সঙ্গিনী বিবিরা বিজ্ঞাপনের ছাপা কাগজ দেখিয়া যেগুলি আনিতে বলিতেন, তাহাই আনিয়া দিলেই আমার কার্য্য সম্পন্ন হইত।

"আমাদের হোটেলের হাব ভাব, জিনিষপত্র, ঘর দ্বার, টেবিল চেয়ার, লোকজনের পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সকলই ইংরাজী হোটেলের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছিল। বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া বাঙ্গালীর এই কারখানা দেখিতে আমোদ করিয়াও অনেক ইংরাজ-দম্পতি আমাদের হোটেলে আসিতেন।

"যজ্ঞেশ্বর বাবু সেই রমণীর সঙ্গে তাঁহার নিজের নিভৃতকক্ষে বসিয়া কথা কহিতেছিলেন। অন্য ঘরেও লোকজন ছিল না, এমন নয়। একটি

ঘরে একজন ইংরাজ ও একজন বিবি ছিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া সেদিন আমি কিছু ব্যস্ত ছিলাম।

"সেই অবকাশে যজ্ঞেশ্বর বাবু ও সেই স্ত্রীলোক চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হইবে। রাস্তায় তাঁহাদের জন্য গাড়ী ছিল কিনা, আমি জানি না। তবে আমি জানি, যজ্ঞেশ্বর বাবু যখন আসিতেন, প্রায় গাড়ীতে আসিতেন।"

গভর্ণমেণ্ট-পক্ষীয় ব্যারিষ্টারের জেরায় হরিহর যে যে কথা বলিয়াছিল, তাহার সারমর্ম্ম উপরে লিখিত হইয়াছে। এইবার বন্দী যজ্ঞেশ্বর মিত্র হরিহরকে যেরূপ জেরা করিয়া যাহা উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা এইরূপ ;—

প্রশ্ন। তুমি বলেছ, আমি পঁচিশে আষাঢ় তারিখে রাত্রি এগারটার সময়ে একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে তোমাদের হোটেলে উপস্থিত হইয়া আমার নিভৃতকক্ষে উপবেশন করি, কেমন ?

উত্তর। আজ্ঞে হাঁ।

প্রশ্ন। সে ঘরে আর কাহারও যাইবার অধিকার ছিল না ?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। যে সময়ে তুমি আমায় আহারাদি যোগাইতেছিলে, সে সময়ে অন্য ঘরেও তুমি তদারক করিতেছিলে—কেমন ?

উত্তর। আজ্ঞে হাঁ।

প্রশ্ন। এখন বল দেখি, আমি আমার সেই নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কি করিয়াছিলাম।

উত্তর। আপনি ঘরের বাহিরে, দেয়ালের গায়ে, আপনার আল্‌ষ্টার কোট রাখিয়া সেই স্ত্রীলোকের হাত ধরিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেন।

প্রশ্ন। আমি যেখানে আমার কোটটি রাখিয়াছিলাম, সেখানে আর কিছু ছিল কি না ?

উত্তর। পাশের কামরায় আর একজন সাহেবের আল্‌ষ্টার কোটও সেইখানে ছিল।

প্রশ্ন। সে স্থানে বিশেষ রকম আলোর বন্দোবস্ত ছিল কি না ?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। আমি চলিয়া আসিবার পূর্ব্বে সেই আল্‌ষ্টার কোট গায়ে দিয়াছিলাম কি না ?

উত্তর। হাঁ।

বিচারপতি। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তুমি বলিয়াছ, যজ্ঞেশ্বর মিত্র যখন হোটেল হইতে চলিয়া আসেন, তখন তোমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

উত্তর। কিন্তু আমি যখন ফিরিয়া আসি, তখন তাঁহাকেও দেখিতে পাই নাই, আর দেয়ালেও একটা বৈ দুইটা কোট ছিল না।

বন্দী। তাহা হইলে তুমি আমায় কোটটা গায়ে দিতে দেখ নাই

উত্তর। না।

বন্দী বলিলেন,"আর তোমাকে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করিবার নাই। বিচারপতির অনুমতি লইয়া তুমি বিদায় গ্রহণ করিতে পার।"

এই সময়ে জজ সাহেবের টিফিনের জন্ত আদালত ভঙ্গ হইল; কিন্তু এই মোকদ্দমায় আদালত সুদ্ধ লোকের এমন আগ্রহ জন্মিয়াছিল যে, বসিবার স্থান যাইবার ভয়ে কেহই নিজ আসন পরিত্যাগ করিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হরিদাস গোয়েন্দার এজেহার

আদালত পুনরায় সমবেত হইলে পর এবার প্রথমেই হরিদাস গোয়েন্দার ডাক হইল। সরকারী তরফের ব্যারিষ্টার তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি একজন ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর—আপনার নাম হরিদাস বাবু?"

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। পঁচিশে আষাঢ় তারিখে বেলা সাতটার সময়ে আপনি বন্দীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তখন যজ্ঞেশ্বর বাবু বাড়ীতে ছিলেন কি?

উত্তর। গিয়াছিলাম। তিনি তখন বাড়ীতে ছিলেন না।

প্রশ্ন। আপনি কাহাদের এজেহার লইয়াছিলেন?

উত্তর। যজ্ঞেশ্বর বাবুর কোচ্‌ম্যান—কমলিনী—আর বাড়ীর অন্যান্য চাকর লোকজনের কাছে তদন্ত আরম্ভ করিয়াছিলাম।

প্রশ্ন। অনুসন্ধানে আপনি কি কি কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ বিচারপতির সম্মুখে বলুন।

উত্তর। আমি অনুসন্ধানে এই পর্য্যন্ত জানিতে পারি যে, তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে যজ্ঞেশ্বর বাবু একজন অপরিচিত স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া প্রায় রাত্রি সাড়ে বারটার সময়ে বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। বাহিরের বৈঠকখানার চাবি তাঁহার নিকটেই ছিল; সেই চাবিতে হল্‌ঘরের দরজা খুলিয়া তিনি স্ত্রীলোককে লইয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করেন। তাহার পর রাত্রে আর তাঁহার কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নাই। সকালে উঠিয়াও কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই।

প্রশ্ন। চাবিটা কোথায় ছিল ?

উত্তর। যজ্ঞেশ্বর বাবুর আলষ্টার কোটের ভিতরে।

প্রশ্ন। আপনি গিয়া কোটটি কোথায় থাকিতে দেখিয়াছিলেন ?

উত্তর। হল্‌ঘরের সম্মুখে কোট রাখিবার জায়গায়।

প্রশ্ন। কোটের পকেটে কোন জিনিষ ছিল ?

উত্তর। হল্‌ঘরের দরজার চাবি, আর একখানা তাস তাঁহার কোটের পকেটে পাওয়া গিয়াছিল।

কোম্পানীর তরফের ব্যারিষ্টার কোটটি চাবিটি ও একখানি তাস হাতে করিয়া তুলিয়া হরিদাস গোয়েন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সেই সব জিনিষ কি না দেখুন দেখি ?"

হরিদাস গোয়েন্দা উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, এই সকল জিনিষই আমি পুলিসে জমা দিয়াছিলাম বটে।"

প্রশ্ন। আপনার তদন্ত শেষ হইলে আপনার সঙ্গে যজ্ঞেশ্বর বাবুর দেখা হইয়াছিল কি না ?

উত্তর। হইয়াছিল। আমি যে সময়ে ভৃত্যদের এজেহার লইতে-ছিলাম, সেই সময়ে হঠাৎ তিনি বাড়ীতে আসিয়া আমি কি উদ্দেশ্যে তথায় উপস্থিত হইয়াছি, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে নিজের পরিচয় দিয়া সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বলিলাম। তিনি আমার কথা শুনিবামাত্রই বলিলেন, 'বলেন কি ?—সর্ব্বনাশ!' এই কথা বলিয়া দ্রুতবেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাই। তিনি তাঁহার স্ত্রীর মৃতদেহ দেখিয়া কম্পিত-কলেবরে পার্শ্বস্থিত একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়েন। আমার স্কন্ধে তাঁহার এই আলষ্টার কোটটি ছিল। আমি তাঁহাকে বলি, এই কোটটি আমাকে লইয়া যাইতে হইবে। তিনি ঘাড় নাড়িয়া আমার কথায় সম্মতি দেন। কিয়ৎ-

ক্ষণ পরেই তিনি আবার আমায় জিজ্ঞাসা করেন, আমি এই কোর্টটি কোথায় পাইয়াছি। আমি প্রকৃত উত্তর প্রদান করিলে তিনি বলেন, 'অসম্ভব!' তাহার পরেই আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, আমি তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহাকে বলি যে, আমার সম্মুখে তিনি যে সকল কথা বলিবেন, তাহা যেন সাবধান হইয়া বলেন। কেন না, সেই সকল কথা আদালতে উঠিতে পারে এবং হয় ত তখন তাঁহার পক্ষে তাহা বিপজ্জনক ও অসুবিধাকর হইয়া দাঁড়াইতে পারে। আমার কথা শুনিয়া তিনি অবাক্ হইয়া কিয়ৎকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং শেষে বলিলেন, 'আদালতে—আমার বিরুদ্ধে!' আমি বলিলাম, 'আজ্ঞা হাঁ, আপনার বাড়ীতে খুন হইয়াছে।' এই কথা শুনিয়া তিনি উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠেন এবং আমার দিকে ফিরিয়া বলেন, 'খুন! আমার বাড়ীতে! আমাকে লোকে সন্দেহ করেছে!' আমি পুনরায় তাঁহাকে আদালতের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে তখন তিনি কথঞ্চিৎ স্থিরভাব ধারণ করেন এবং আমায় ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করেন।

হরিদাস গোয়েন্দার কথা শেষ হইলে বিচারপতি বন্দীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু এবার যজ্ঞেশ্বর আর কিছু জেরা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। আদালতসুদ্ধ লোক সকলেই বিস্মিতের ন্যায় বন্দীর মুখ পানে চাহিয়া ছিলেন। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, যে সময়ে সরকারী ব্যারিষ্টার হরিদাস গোয়েন্দাকে বন্দীর আলষ্টার কোটের পকেট হইতে প্রাপ্ত তাসখানি দেখাইতেছিলেন, সে সময়ে বন্দীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং তিনি যেন অত্যন্ত বিস্মিত ও চমকিত হইয়াছিলেন। যে তাসখানি আদালতে দেখান হইয়াছিল, সেখানি হরতনের নওলা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কমলিনীর এজেহার

"আমার নাম কমলিনী। আমি হেমাঙ্গিনীর প্রতিবাসিনী। অকালে আমার পিতামাতা কালকবলিত হওয়ায় বাল্য-প্রণয়-বশতঃ হেমাঙ্গিনী আমায় আশ্রয় দান করেন। বালিকাকালে হেমাঙ্গিনীর সহিত আমার বড় ভাব ছিল। সেই ভালবাসার খাতিরে আমার দুরবস্থায়, তিনি আমায় সহচরীরূপে নিযুক্ত করেন। যে সময়ে হেমাঙ্গিনীর বিবাহ হয়, তখন তাহার পিতামাতা উভয়েই জীবিত ছিলেন।

"হেমাঙ্গিনী বিবাহের পূর্ব্বে যজ্ঞেশ্বর বাবুকে বড় ভালবাসিতেন। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর বাবু—মৌখিক কিছু ত্রুটি না থাকিলেও আমার বিশ্বাস —অন্তরে হেমাঙ্গিনীকে ভালবাসিতেন না।

"হেমাঙ্গিনী দেখিতে মন্দ ছিলেন না। তাঁহার মনের দৃঢ়তা কম থাকিলেও তিনি বড় একগুঁয়ে ছিলেন; যাহা একবার ধরিতেন, তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতেন না। কথাবার্ত্তায় হেমাঙ্গিনী বড় মিষ্টভাষিণী ছিলেন না। যজ্ঞেশ্বর মিত্রের সহিত যখন বিবাহ হয়, তখন হেমাঙ্গিনীর বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। যজ্ঞেশ্বর বাবুর বয়স তখন আটাশ বৎসর। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি প্রায় হেমাঙ্গিনীর পিত্রালয়ে যাইতেন। সেই সূত্রে আলাপ পরিচয় হয়।

"হেমাঙ্গিনীর পিতা ঘোড়দৌড়ের বাজী ধরিতেন। তিনি একজন বুক-মেকার ছিলেন। যজ্ঞেশ্বর বাবুরও ঘোড়দৌড় খেলার বাতিক

ছিল। বাজী রাখিবার জন্যই তিনি হেমাঙ্গিনীর পিতার নিকটে আসিতেন। হেমাঙ্গিনীর পিতা রামসুন্দর বাবু ভদ্রসমাজে মিশিতেন না, কিন্তু তাঁহার যথেষ্ট অর্থ ছিল। সেই অর্থবলেই তিনি যজ্ঞেশ্বর বাবুর সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতে পারিয়াছিলেন। ঘোড়দৌড়ের বাজীতে যজ্ঞেশ্বর বাবু বিস্তর টাকা হারিয়া ঋণী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। সেই অবস্থায় তিনি রামসুন্দর বাবুর শরণাপন্ন হওয়াতে রামসুন্দর বাবু তাঁহার দেনা পরিশোধ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন এবং নিজ কন্যাকে বিবাহ করিতে বলেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু দেনার দায়ে অগত্যা অনিচ্ছাসত্বেও হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করিতে সম্মত হয়েন।

"এই বিবাহে রামসুন্দর বাবু যজ্ঞেশ্বর বাবুর সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়াও তাঁহাকে বিশ হাজার এবং হেমাঙ্গিনীকে দশ হাজার টাকা ও একখানি বাড়ী যৌতুকস্বরূপ দান করেন। তাহার পর রামসুন্দর বাবুর ও তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তিই হেমাঙ্গিনীই প্রাপ্ত হন। যজ্ঞেশ্বর বাবুর তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার ছিল না; তবে হেমাঙ্গিনীর মৃত্যু হইলে যজ্ঞেশ্বর বাবু সেই বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন, এ কথা রামসুন্দর বাবুর উইলে লেখা ছিল।

"হেমাঙ্গিনীর বিবাহ দিনে বরযাত্রী কেহ ছিলেন না। যজ্ঞেশ্বর বাবু ইতরশ্রেণীর লোকের কন্যাকে বিবাহ করিতেছেন ভাবিয়া, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই। বিবাহ একপ্রকার গোপনেই হইয়াছিল। বরযাত্রী কেহ উপস্থিত হন নাই বলিয়া রামসুন্দর বাবু বড় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন।

"বিবাহের পর ক্রমে ক্রমে যজ্ঞেশ্বর বাবুর চরিত্রের বিকাশ হইতে

লাগিল। তিনি প্রায়ই রজনীতে বাড়ীতে থাকিতেন না। কোনদিন অধিক রাত্রে বাড়ীতে আসিতেন ; কিন্তু হয় ত তখন তাঁহার কথা কহিবারও সামর্থ্য থাকিত না। মদের নেশায় অজ্ঞানবৎ হইয়া গাড়ীতে করিয়া বাড়ীতে আসিতেন এবং যেখানে-সেখানে পড়িয়া রাত্রি কাটাইতেন। হেমাঙ্গিনী বা আমি কোনদিন তাঁহাকে সিঁড়ীতে, কোনদিন সদর দরজার কাছে, কোনদিন দাওয়ায়, কোনদিন ছাদে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতাম। চাকর লোকজন দিয়া ধরাধরি করিয়া তখন তাঁহাকে তাঁহার শয্যায় আনিয়া শয়ন করান হইত। যখন তাঁহার চৈতন্য হইত, তখন হেমাঙ্গিনী যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও গালি-গালাজ করিতেন। তাহাতে যজ্ঞেশ্বর বাবু একটি কথারও উত্তর প্রদান করিতেন না। হেমাঙ্গিনী তাহাতে আরও জ্বলিয়া উঠিতেন—আরও অধিক গালি-গালাজ করিতেন। যখন একান্ত অসহ্য বোধ হইত, তখন কোন কোন দিন যজ্ঞেশ্বর বাবু বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেন এবং দুই-চারিদিন আর দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন না।

"হেমাঙ্গিনী তাহাতে বড় অস্থির হইতেন। তিনি সারাদিন সারারাত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেন। আমি বুঝাইতে গেলে বলিতেন, 'কমলিনী ! আর তিনি আসিবেন না। আমি তাঁহাকে অকথা-কুকথা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। না জানি, তাহাতে তাঁহার মনে কত ক্লেশ হইয়াছে। তাহাই তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। হায় ! আমার মত অভাগিনী, আমার মত পাপিষ্ঠা, বোধ হয়, জগতে আর কেহ নাই।' কাহারও পদশব্দ পাইলেই অমনই হেমাঙ্গিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেন, 'ঐ তিনি আসিয়াছেন—আর আমি তাঁহাকে তিরস্কার করিব না, আর কখনও তাঁহাকে কিছু বলিব না, আর তাঁহার মনে কষ্ট দিব না।' রজনীতে

সদর দরজায় কেহ ধাক্কা দিলে বা বাতাসের জোরে সেই প্রকার কোনরূপ শব্দ পাইলে অমনই হেমাঙ্গিনী দ্রুতবেগে নীচে নামিয়া আসিতেন; কিন্তু তাঁহার স্বামীকে দেখিতে না পাইলে সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া হতাশভাবে চোখের জল ফেলিতেন। আমার ভয় হইত, পাছে, তিনি বায়ুরোগগ্রস্ত হন—পাছে, তিনি পাগলিনীর ন্যায় বাড়ীর বাহির হইয়া যান।

"যজ্ঞেশ্বর বাবু যখন যথার্থই ফিরিয়া আসিতেন, তখন হেমাঙ্গিনী দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিতেন, বুকের ভিতরে মুখ লুকাইয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেন, বারংবার স্বামীর পা ধরিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেন। ইহাতে যজ্ঞেশ্বর বাবু কখন কথা কহিতেন, কখন নীরব হইয়া থাকিতেন, কখনও বা বলিতেন, 'যখন গালি দাও, তখন কি এ সব কিছুই মনে থাকে না? বিবেচনা করিয়া কথা বলিলে ভাল হয় না কি?' হায়! কি ভয়ানক কষ্টের জীবনই তাঁহারা উভয়ে অতিবাহিত করিতেন! কিন্তু আশ্চর্য্য, যজ্ঞেশ্বর বাবুর ক্ষমতা ও সহ্য গুণ! তিনি সকল সময়ে অভিমান করিয়া, কি রাগ করিয়া একটিও রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। অন্তরে তিনি যতই বিরক্ত হউন না কেন, মুখে তাহার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পাইত না।

"হেমাঙ্গিনী আমাকে বড় বিশ্বাস করিতেন। সুখ দুঃখের কথা, প্রাণের কথা, মনের কথা সকল কথাই তিনি আমায় বলিতেন। এমন কি কখন কখন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিতেন, 'আচ্ছা, বল দেখি, কমলিনী! আমার স্বামী আমায় ভালবাসেন কি না।' আমি উত্তর দিতাম, 'সে বিষয় তুমিই বলিতে পার, আমি কেমন করিয়া জানিব?' তাহাতে হেমাঙ্গিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেন, 'আমার স্বামী আর কাহাকেও ভালবাসেন বা আমার সহিত বিবাহের পূর্ব্বে অপর কাহাকে

ভালবাসিতেন, এরূপ বোধ হয় কি ?' পাছে তাঁহার কোমল হৃদয়ে ব্যথা লাগে, এইজন্য আমি বলিতাম, 'না, তা কখন সম্ভব নয়।' কিন্তু হেমাঙ্গিনী ইহাতেও কখন কখন বিরলে অশ্রুবর্ষণ করিয়া তাপিত প্রাণ কতকটা শীতল করিবার চেষ্টা করিতেন।

"হেমাঙ্গিনীর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, 'কমলিনী! আমার স্বামী যে অপর একজন স্ত্রীলোককে ভাল বাসেন, তাহার প্রমাণ আমি পাইয়াছি।' তখনই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, হেমাঙ্গিনী আর অধিক দিন বাঁচিবেন না। একে তিনি দিবারাত্র স্বামীর কথাই চিন্তা করিতেন, তাহার উপরে এই ঘটনা জানিতে পারিয়া কি পর্য্যন্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাহা আমি কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আর সেই সর্ব্বান্তর্যামী বিধাতাই বুঝিয়াছিলেন। হেমাঙ্গিনী নিজে কিন্তু বুঝিতে পারেন নাই যে, এইরূপ চিন্তায় ধীরে ধীরে তাঁহার আয়ুঃক্ষয় হইতেছে। যজ্ঞেশ্বর বাবুর প্রতি হেমাঙ্গিনীর ঐকান্তিক স্বামীভক্তি থাকাই সকল সর্ব্বনাশের মূল।

ব্যারিষ্টার। আচ্ছা, এখন বল দেখি, যজ্ঞেশ্বর বাবু ও হেমাঙ্গিনী কি এক ঘরে শয়ন করিতেন।

কমলিনী। না।

ব্যারিষ্টার। এরূপ ভাব কত দিন হইতে দেখিয়াছিলে ?

কমলিনী। যত দিন তাঁহাদের এই প্রকার মনোমালিন্য হইয়াছিল, ততদিন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে শয়ন করিতেন।

ব্যারিষ্টার। এখন তুমি পঁচিশে আষাঢ় তারিখের প্রাতঃকাল হইতে ছাব্বিশে আষাঢ় তারিখের প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু দেখিয়াছিলে বা শুনিয়াছিলে, সে সমস্ত একে একে বর্ণন কর।

কমলিনী। পঁচিশে আষাঢ় সকাল বেলা হেমাঙ্গিনী আমায় ডাকিয়া

বলেন যে, গত রাত্রে তিনি ভয়ানক কুস্বপ্ন দেখিয়া বড় ভয় পাইয়াছেন। সে সকল স্বপ্নের কোন অর্থ ছিল না, অথচ তাঁহার মনে হইতেছিল, যেন কি একটা ভয়ানক অনর্থ ঘটিবে। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার স্বামী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন কি না? তাহাতে আমি উত্তর করি যে, যজ্ঞেশ্বর বাবু অনেকক্ষণ শয্যাত্যাগ করিয়াছেন এবং সকাল সকাল আহারাদির আয়োজন করিতে হুকুম দিয়াছেন। তিনি আমায় বলিয়াছেন যে, বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে যখন তাঁহার স্ত্রী সুবিধা বিবেচনা করিবেন, তখন যেন একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাঁহার কি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে। হেমাঙ্গিনী তাহাতে উত্তর করেন, 'তুমি তাঁহাকে বল যে, আহারের পর যেন তিনি আমার ঘরে আসেন।' আমি সেই কথা বলিবার জন্য যখন যজ্ঞেশ্বর বাবুর ঘরে যাই, তখন তিনি চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে আহারীয় সমস্তই পড়িয়া শীতল হইয়া যাইতেছিল, অথচ সেদিকে যেন তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার হাতে একখানি পত্রও ছিল। মাঝে মাঝে সেইখানির লেখা দেখিতেছিলেন ও একমনে কি ভাবিতেছিলেন। আমি তাঁহার ঘরে যাইয়া তাঁহার পিছনে প্রায় পনের মিনিটকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম, তথাপি তাঁহার চৈতন্য হইল না। অবশেষে আমি তাঁহাকে যথারীতি সম্বোধন করিয়া হেমাঙ্গিনীর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করাতে তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা,আহারাদি করিয়া তাঁহার নিকট যাইব।' হেমাঙ্গিনীকে আমি এই সকল কথা বলাতে তিনি আমায় বলিলেন, 'আচ্ছা, এখন তোমায় আমার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। তুমি কেবল দেখিও, যেন তিনি ভুলিয়া বাহিরে চলিয়া না যান।' আমি চলিয়া আসিলাম। অর্দ্ধঘণ্টা পরে আমি উপরে হেমাঙ্গিনী ও যজ্ঞেশ্বর বাবুর উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম।

তাঁহারা কি একটা কথা লইয়া বিবাদ করিতেছিলেন। তখনই আমি উপরে উঠিলাম। দেখিলাম, যজ্ঞেশ্বর বাবু অত্যন্ত ক্রোধভরে হেমাঙ্গিনীর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমি আর তাঁহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া হেমাঙ্গিনীর কাছে গেলাম। তাঁহার চেহারা দেখিয়াই বোধ হইল, ঝগড়াটা কিছু গুরুতর রকমেই হইয়াছিল। কেন না তিনি তখনও রাগে ফুলিতেছিলেন, হাঁপাইবার মত তাঁহার ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছিল। আর——

ব্যারিষ্টার। (বাধা দিয়া) চুপ কর। তুমি যখন উপরে উঠিতেছিলে, তখন তুমি তাহাদের কোন কথা শুনিতে পাইয়াছিলে?

কমলিনী। ঠিক স্পষ্ট ব্যাপারটা বুঝিতে পারি নাই, তবে তাঁহারা দুইজনেই খুব রাগের সহিত উচ্চস্বরে কথা কহিতেছিলেন। আমার বোধ হইয়াছিল, যেন যজ্ঞেশ্বর বাবু হেমাঙ্গিনীকে কোন বিষয় লইয়া শাসন করিতেছিলেন।

ব্যারিষ্টার। কোন কথা শুনিতে পাইয়াছিলে?

কমলিনী। হাঁ, হেমাঙ্গিনী খুব ক্রোধভরে বলিতেছিলেন, 'আমি বাঁচিয়া থাকিতে কখনও তাহা হইবে না। আমি মরিয়া গেলে তুমি বাঁচ, তোমার হাড় জুড়ায়, কেমন? কিন্তু আমি এত শীঘ্র মরিতেছি না—খুন না করিলে আমি সহজে তোমায় ছাড়িয়া যাইতেছি না—তুমি মনে করিয়াছ, নির্ব্বিঘ্নে আমার বাপের বিষয় ভোগ করিবে? তাহা তুমি মনেও স্থান দিও না।'

ব্যারিষ্টার। এই কথাগুলি তুমি স্পষ্ট শুনেছ? আচ্ছা, তাহাতে যজ্ঞেশ্বর বাবু কি উত্তর করিলেন?

কমলিনী। কিছুই না, তাহাতে হেমাঙ্গিনী আরও রাগিয়া উঠিয়া আরও উচ্চস্বরে গালিগালাজ করিতে লাগিলেন।

ব্যারিষ্টার। যজ্ঞেশ্বর বাবু ত তখন রাগিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সমস্ত দিনের মধ্যে তাঁহাকে আর ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছিলে?

কমলিনী। না।

ব্যারিষ্টার। হেমাঙ্গিনী তাহার পর তোমায় কিছু বলিয়াছিলেন?

কমলিনী। অনেক কথা বলিয়াছিলেন, সব কথা এখন আমার ঠিক স্মরণ নাই। তবে একটি কথা আমার বেশ মনে আছে যে, তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, 'আমি এখন আমার স্বামীর চক্ষুঃশূল হইয়াছি, আমি মরিয়া গেলেই তিনি এখন বাঁচেন, সুখে-স্বচ্ছন্দে আমার বিষয়-সম্পত্তি ভোগ-দখল করিতে পারেন; তাই আমায় এত অনাদর! তাই প্রতি কথায় এত অপমান! কেন আমি কি করিয়াছি? উনি জানেন না বুঝি যে, আমার জন্য উনি এখনও টিকিয়া আছেন, আমি মনে করিলে পথে বসাইতে পারি, জেল খাটাইতে পারি—সর্ব্বনাশ করিতে পারি।'

ব্যারিষ্টার। কেন তিনি এ সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার তুমি কিছু কারণ জান?

কমলিনী। হাঁ, হেমাঙ্গিনী রাগের মাথায় সেদিন আমার কাছে অনেক কথাই বলিয়া ফেলিয়াছিলেন; কিন্তু সে সব কথা গোলমাল হইয়া গিয়াছে, সব মনে পড়ে না। সে কত টাকা-কড়ির কথা—কত হেণ্ডনোটে ধারের কথা—কত দলিল-দস্তাবেজের কথা—আমি স্ত্রীলোক, সব কি মনে রাখিতে পারি?

ব্যারিষ্টার। দুই-একটা কথাও মনে পড়ে না? একটু ভাবিয়া দেখ না? এত কথা হইয়াছিল, তাহার দু-একটাও মনে পড়িবে না?

কমলিনী। হেমাঙ্গিনী আরও বলেন, 'উনি সেই সব কাগজপত্র ফাঁকী দিয়া আমার কাছ থেকে লইতে চান। আমি তেমনই নির্ব্বোধ

কি না, যে উনি আমার সেই কাগজপত্রগুলি ঠকিয়ে বাহির করিয়া লইবেন। যদি আমার কথা শুনিয়া চলিতেন, আমায় কিছুমাত্র অযত্ন না করিতেন, তা হলেও যাহা হয়, আমি করিতাম। যখন এত অনাদর—এত অপমান—এত পায়ে ঠেলা—তখন কখনই আমি সে সব ছাড়িয়া দিব না।'

ব্যারি। সেদিন তুমি বরাবর হেমাঙ্গিনীর কাছে ছিলে?

কমলিনী। হাঁ।

ব্যারিষ্টার। অন্য সময়ে ঝগড়া হইলে হেমাঙ্গিনী তার পর বড় অনুতাপ করিতেন, স্বামীর জন্য সারাদিন বড় ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন, এ কথা তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ। আচ্ছা, এ দিনে হেমাঙ্গিনীর সে প্রকার কোন ভাব দেখিয়াছিলে?

কমলিনী। তাহা হইয়াছিল বৈ কি! তবে এবার আর ততটা হয় নাই। সন্ধ্যার কিছু আগে হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত হেমাঙ্গিনী প্রায় আট-দশবার আমাকে তাঁহার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রায়ই আধঘণ্টা অন্তর তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন কি না, সে সংবাদ লইয়াছিলেন।

ব্যারিষ্টার। তোমরা সেদিন কখন নিদ্রা গিয়াছিলে?

কমলিনী। দশটার পর।

ব্যারিষ্টার। যখন তুমি হেমাঙ্গিনীর ঘর হইতে আসিয়া নিজের ঘরে শুইতে যাও, তখন ইহা কি লক্ষ্য করিয়াছিলে যে, হেমাঙ্গিনীর শোবার খাটের পাশে একটি টিপাই ছিল, আর সেই টিপাইএর উপরে কতকগুলি জিনিষও ছিল?

কমলিনী। সে ত রোজই তাঁহার থাকিত—টিপাইটা ত বিছানার কাছেই থাকে।

ব্যারিষ্টার। টিপাইএর উপরে কি ছিল, বল দেখি।

কমলিনী। একটি ছোট শ্বেত পাথরের কুঁজোয় এক কুঁজো জল, একটি বড় কাঁচের গ্লাস, আর একটা ঔষধের শিশি।

ব্যারিষ্টার। কি ঔষধ! তাহাতে কি লেখা ছিল, তাহা জান?

কমলিনী। তাহাতে ঔষধের নাম লেখা ছিল না, তবে ইংরাজীতে লেখা ছিল 'বিষ'। হেমাঙ্গিনীর শিরঃপীড়া রোগ ছিল বলিয়া বিশেষ কষ্ট হইলে নিদ্রার জন্য তিনি এই ঔষধ সেবন করিতেন। শিরঃপীড়ার কষ্ট অনুভব করিতে হইবে না বলিয়াই তিনি এই ঔষধ আনাইতেন।

ব্যারিষ্টার। শিশিতে কত দাগ ঔষধ ছিল, তাহা বলিতে পার?

কমলিনী। বোধ হয়, সাত দাগ ঔষধ ছিল। কেন না, আমি জানি, এই রকম শিশিতে আট দাগ করিয়া ঔষধ থাকিত। এক দাগের বেশি হেমাঙ্গিনী কখন খাইতেন না। এই ঔষধের শিশিটা তার পূর্ব্ব দিনে আনান হইয়াছিল।

ব্যারিষ্টার। ঐ ঔষধ কতটা সেবন করিলে একটা মানুষের জীবন নষ্ট হইতে পারে, তাহা হেমাঙ্গিনী জানিতেন?

কমলিনী। জানিতেন, তিনিই একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এই ঔষধের চারি দাগ যদি কোন লোকে একেবারে খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সে এমন নিদ্রিত হইবে যে, আর কখন তাহাকে সেই নিদ্রা হইতে জাগিতে হইবে না।

ব্যারিষ্টার। জানিয়া-শুনিয়া তিনি এরকম বিষ কাছে রাখিতেন কেন?

কমলিনী। তাঁহার শিরঃপীড়া এত অধিক কষ্টদায়ক হইত যে, সে সময়ে অজ্ঞান-অচৈতন্য হইবার ঔষধ ভিন্ন আর কি ব্যবহার করিবেন? বিশেষতঃ হেমাঙ্গিনী বুদ্ধিমতী ছিলেন, জীবনে তাঁহার বড় মায়া ছিল—মৃত্যুকে তিনি বড় ভয় করিতেন।

ব্যারিষ্টার। টিপাইএর উপরে আর কোন দ্রব্য থাকিত ?

কমলিনী। কালি কলম ও লিখিবার কাগজ থাকিত।

ব্যারিষ্টার। তোমার শয়ন করিবার ঘর একতলায় না দোতলায় ?

কমলিনী। একতলায়।

ব্যারিষ্টার। বাহির হইতে যদি কোন লোক বাড়ীর ভিতরে আসিয়া উপরে উঠিত, তাহা হইলে তোমার তাহা টের পাইবার সম্ভাবনা ছিল ?

কমলিনী। হাঁ।

ব্যারিষ্টার। রাত্রে তুমি কোন লোকের গলার শব্দ, পায়ের শব্দ বা অন্য কোন রকম শব্দ শুনিয়াছিলে ?

কমলিনী। রাত্রি সাড়ে বারটা পর্য্যন্ত আমার ঘুম হয় নাই। আমি আমার ঘরে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিলাম। সেই সময়ে বাহিরে সদর দরজা খোলার শব্দ আমি শুনিতে পাই। একখানি গাড়ী দরজায় আসিয়া লাগিল এবং চলিয়া গেল, তাহাও আমি অনুভবে জানিতে পারি। আমার ঘরের দরজা একটু ফাঁক করিয়া আমি দেখিতে পাই যে, যজ্ঞেশ্বর বাবু ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া প্রথমেই হলঘরে প্রবেশ করেন।

ব্যারিষ্টার। তুমি আর কিছু দেখ নাই ?

কমলিনী। না।

ব্যারিষ্টার। আর কোন প্রকার শব্দ শুন নাই ?

কমলিনী। শুনিয়াছিলাম। যজ্ঞেশ্বর বাবু এত রাত্রে কেন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, তিনি হলঘরে প্রবেশ করিয়া কি করিতেছেন, এই সকল জানিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হওয়াতে আমি সিঁড়ীর পাশে অন্ধকারে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকি। অনেকক্ষণ ধরিয়া আমি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে সে ঘর হইতে বাহির হইতে দেখি নাই। তাহার পর

আমি দেখিতে পাই যে, যজ্ঞেশ্বর বাবু চোরের ন্যায় নিঃশব্দে উপরে উঠিতেছেন। তাঁহার তখনকার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হয়। নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দ্বিতলে উঠিতে, তিনি এত ভয়ে ভয়ে পা টিপিয়া নিঃশব্দে উপরে উঠিতেছেন দেখিয়া, আমার মনে হয় যে, নিশ্চয় তাঁহার মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে; অথবা তিনি যে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন, এ কথা যাহাতে কেহ জানিতে না পারে, ইহাই তাঁহার অভিলাষ ছিল। আমার মনে সেই সময়ে কত প্রকার সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না।

ব্যারিষ্টার। যাক্, তোমার সন্দেহের কথা ছাড়িয়া দাও। যজ্ঞেশ্বর বাবুর পশ্চাতে আর কাহারও পদশব্দ তুমি লক্ষ্য করিয়াছিলে?

কমলিনী। তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তাঁহার সঙ্গে যে অন্য কোন লোক উপরে উঠিবেন, এ কথা আমার মনে এক-বারও উদয় হয় নাই। তবে ভাবগতিক দেখিয়া আমার মনে কেমন এক প্রকার আতঙ্ক উপস্থিত হওয়াতে আমি তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের ভিতরে গিয়া দরজায় অর্গল বন্ধ করি।

ব্যারিষ্টার। তার পর তুমি আর কিছু শুনিতে পাও?

কমলিনী। হাঁ, উপরের ঘরের দরজা খোলার শব্দ পাই। অনেক-ক্ষণ পরে আবার যেন কে সিঁড়ী দিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে, আমার এইরূপ অনুমান হয়। তাহার পরেই সদর দরজা খোলা এবং পুনরায় দেওয়ার শব্দ আমার কানে গেল। মনে তখন এত ভয় হইয়াছিল যে, ঘরের বাহির হইয়া দেখিবার সাহস আমার হয় নাই। সেই ভয়েই আমি নিদ্রিত বা অচৈতন্য হইয়া পড়ি। প্রায় রাত্রি চারিটার সময়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তখন চারিদিক অন্ধকার। বাড়ীতে কোন প্রকার সাড়া-শব্দ নাই। আমার মনে একটু সাহস হওয়াতে আমি

তাড়াতাড়ি একটা বাতী জ্বালিয়া সদর দরজা খোলা আছে কি না দেখিতে যাই।

ব্যারিষ্টার। হল্‌ঘরের সম্মুখ দিয়া তুমি সদর দরজার দিকে গিয়াছিলে?

কমলিনী। হাঁ।

ব্যারিষ্টার। আল্‌ষ্টার কোট, টুপি, ছড়ি, জুতা প্রভৃতি রাখিবার র‍্যাক্, হল্‌ঘরের বহির্দ্দেশে কোন্‌দিকে অবস্থিত, তাহা তুমি বলিতে পার?

কমলিনী। হল্‌ঘর হইতে বাহির হইতে বামে এবং হল্‌ঘরে প্রবেশ করিতে দক্ষিণে।

ব্যারিষ্টার। সদর দরজার দিকে যাইবার সময়ে সেদিকে তোমার নজর পড়িয়াছিল?

কমলিনী। পড়িয়াছিল।

ব্যারিষ্টার। কি দেখিয়াছিলে?

কমলিনী। যজ্ঞেশ্বর বাবুর আল্‌ষ্টার কোটটি সেই আল্‌নায় ঝুলান রহিয়াছে, দেখিতে পাইয়াছিলাম।

ব্যারিষ্টার। সে আল্‌ষ্টার কোটটি এখন দেখিলে তুমি চিনিতে পার?

কমলিনী। পারি। সে রকম কাপড়ের কোট প্রায় অন্য কোন সাহেবের গায়ে দেখা যায় না। সে এক রকম নূতন রংএর চমৎকার বনাত।

ব্যারিষ্টার তখন একটি আল্‌ষ্টার কোট কমলিনীকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, এইটিই সেই কোট কি না।"

উত্তর। হাঁ, এইটিই বটে।

প্রশ্ন। টুপিটিও কি তুমি সেই সময়ে আল্‌নায় থাকিতে দেখিয়াছিলে ?

উত্তর। না, টুপিটি সে সময়ে আল্‌নায় ছিল না।

প্রশ্ন। তুমি সদর দরজায় গিয়া কি দেখিলে ?

উত্তর। যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহাই। সদর দরজা অর্গলবদ্ধ ছিল না। যজ্ঞেশ্বর বাবু প্রতিদিনই অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন, আর নিজে সদর দরজা অর্গলবদ্ধ করিয়া উপরে উঠিতেন। চাকরেরা তত রাত্রি পর্য্যন্ত কেহই জাগিয়া থাকিত না। সুতরাং তিনি যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন, তখনই তিনি নিজ হস্তে সদর দরজা অর্গলবদ্ধ করিতেন। আমি পূর্ব্বে যে সদর দরজা খোলা ও দেওয়ার শব্দ পাইয়াছিলাম, সেটা যে সত্য, তাহা আমার এতক্ষণ পরে স্থিরসিদ্ধান্ত হইল। আমি ভাবিলাম যে, যজ্ঞেশ্বর বাবু তবে যথার্থই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

ব্যারিষ্টার। তার পর তুমি যাহা কিছু দেখিয়াছিলে বা শুনিয়াছিলে, সব বলিতে থাক।

কমলিনী। আমার মনের সন্দেহ ঘুচাইবার জন্য তখন আমি সদর দরজা হইতে ফিরিয়া আসিয়া উপরে উঠিলাম। যজ্ঞেশ্বর বাবুর ঘরের দরজা বন্ধ ছিল না। আমি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। সে ঘরে তখন কেহই ছিল না—যজ্ঞেশ্বর বাবুও ছিলেন না। শয্যার কাছে গিয়া ভাল করিয়া আলো ধরিয়া দেখিলাম,তাঁহার শয্যায় কেহ নাই। বিছানা যেমন পরিষ্কার, তেমনই রহিয়াছে ; কেহ যে সে বিছানায় সে রাত্রে শয়ন করিয়াছিল, এরূপ কোন চিহ্ন দেখিলাম না। তখন সে ঘর হইতে বাহির হইয়া হেমাঙ্গিনীর ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম,তিনি শয্যায় মৃতবৎ পড়িয়া আছেন, তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস রহিত হইয়াছে। মনে অত্যন্ত ভয় হইল। তাঁহাকে দুই-তিনবার ডাকিলাম, কোন উত্তর পাই-

লাম না। ধাক্কা মারিয়া দেখিলাম, তাহাতে তাঁহার চৈতন্য হইল না। তাঁহাকে উঠাইয়া শয্যায় বসাইতে চেষ্টা করিলাম, মৃতদেহের ন্যায় তাঁহার মাথা একপাশে হেলিয়া পড়িল। তাহার পরে যে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আর আমি বলিতে পারি না। এই পর্য্যন্ত আমার মনে পড়ে যে, হেমাঙ্গিনীকে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিয়া আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠি; সেই চীৎকারে চাকর, লোকজন, দাস দাসী সকলেই জাগরিত হইয়া ছুটিয়া উপরে আসে এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে আমি তাহাদিগকে হেমাঙ্গিনীর মৃতদেহ দেখাইয়া দিই।

ব্যারিষ্টার। আচ্ছা, তোমার এমন কথা কিছু মনে পড়ে যে, যখন তুমি চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল, তখন বলিয়াছিলে যে, যজ্ঞেশ্বর বাবু হেমাঙ্গিনীকে খুন করিয়াছেন?

কমলিনী। না, মনে পড়ে না, তবে আমার মুখ থেকে এ রকম কথা বাহির হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। যজ্ঞেশ্বর বাবু হেমাঙ্গিনীকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা আমি জানিতাম; সেইদিন যজ্ঞেশ্বর বাবুর সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর কি প্রকার বিবাদ হইয়াছিল, তাহাও শুনিয়াছিলাম; যজ্ঞেশ্বর বাবু অধিক রাত্রে নিঃশব্দে পা টিপিয়া উপরে উঠিয়াছিলেন এবং পুনরায় বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। এ সকল দেখিয়া-শুনিয়া আমার প্রথমেই তাঁহার উপরে সন্দেহ হইয়াছিল; সুতরাং তিনিই যে খুন করিয়াছেন, এ কথা যদি আমি বলিয়া থাকি, তাহাও কিছু বিচিত্র নয়।

ব্যারিষ্টার। তার পর যজ্ঞেশ্বর বাবুর একজন চাকর ছুটিয়া পুলিসে যায় এবং কিয়ৎক্ষণ পরে হরিদাস গোয়েন্দা তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। হেমাঙ্গিনীর মৃতদেহ দেখিয়া তিনি প্রথমেই কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন?

কমলিনী। তখন আমি কতকটা সুস্থ হইয়াছি। তিনি আমাকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন, এ ঘরের যেখানে যে জিনিষটি ছিল, সেইখানে সেই জিনিষটি এখনও ঠিক আছে কি না দেখ।, আমি তাঁহার কথায় ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখি। তিনি আমায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, 'ঘরের কোন জিনিষ নড়িয়াছে কি?' আমি উত্তর করি, 'না কোন জিনিষ নড়ে নাই।'

ব্যারিষ্টার। যখন তুমি উত্তর দিয়াছিলে, তখন টেবিলের দিকে কি তোমার লক্ষ্য ছিল?

কমলিনী। সব জিনিষই ছিল, কেবল্ শিশিতে ঔষধ ছিল না।

ব্যারিষ্টার। হরিদাস গোয়েন্দার কাছে তুমি এ কথার কিছু উল্লেখ করিয়াছিলে?

কমলিনী। বোধ হয়, করিয়াছিলাম।

ব্যারিষ্টার। আচ্ছা, পঁচিশে আষাঢ় তারিখের দিনের বেলায় হেমাঙ্গিনী তোমায় অনেক দলিল-দস্তাবেজ হাণ্ডনোট প্রভৃতির কথা বলিয়াছিলেন। তুমি সে সম্বন্ধে আর কিছু জান?

কমলিনী। না।

ব্যারিষ্টার। তুমি বলিতে পার, হেমাঙ্গিনীর মৃত্যুর পর আজ পর্য্যন্ত কোন কাগজ-পত্র বেরিয়েছে কি না?

কমলিনী। তাহা আমি বলিতে পারি না।

ব্যারিষ্টার। যজ্ঞেশ্বর বাবু বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন্ কখন?

কমলিনী। বেলা সাতটার সময়ে।

ব্যারিষ্টার। যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার গায়ে কোন ওভার কোট ছিল কি?

কমলিনী। না।

ব্যারিষ্টার। তখন তাঁহার চেহারা কি রকম ছিল ?

কমলিনী। খুব খারাপ! সারা রাত্রি নেশা করিয়া জাগিয়া থাকিলে যে রকম চেহারা হয়, সেই রকম। চুল উস্‌কো-খুস্‌কো, অপরিষ্কার; চক্ষু দুটি লালবর্ণ, আর——

ব্যারিষ্টার বলিলেন, "থাক, আর কিছু বলিতে হইবে না, ইহাই যথেষ্ট হইবে, আর আমি কিছু জানিতে চাহি না।"

কোম্পানীর তরফের ব্যারিষ্টার বসিলে বিচারপতি বন্দী যজ্ঞেশ্বরের দিকে চাহিলেন। যজ্ঞেশ্বর নিজ পক্ষসমর্থনের জন্য পূর্ব্ব হইতে যে প্রকার ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবারও সেই প্রকার ভাব দেখাইলেন। অতি সামান্য দু-একটি প্রশ্ন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন।

তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিয়াছ যে, পঁচিশে আষাঢ় তারিখে আমার সহিত আমার স্ত্রী হেমাঙ্গিনীর একটা বিশেষ বিবাদ হয়। সে বিবাদে আমি তাঁহাকে শাসিয়ে শাসিয়ে ভয় দেখিয়ে যেন কোন কথা বলিয়াছিলাম। আচ্ছা, এ রকম ভাবে ভয় দেখান বা শাসান, আর পূর্ব্বে কখন শুনিয়াছিলে ?

কমলিনী। অনেকবার শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এত উচ্চস্বরে আপনাদের উভয়কে কথা কহিতে আর কখনও আমি শুনি নাই।

যজ্ঞেশ্বর। তুমি জান, তোমার কথার উপরে আমার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে ?

কমলিনী। জানি।

যজ্ঞেশ্বর। আর তুমি যে রকম ভাবে এজেহার দিয়াছ, তাহাতে আমার ফাঁসী বা দ্বীপান্তর দণ্ড হইতে পারে ?

কমলিনী। তাহা আমি অত-শত জানি না। আমি যাহা প্রকৃত ঘটনা তাহাই বলিয়াছি।

যজ্ঞেশ্বর। আচ্ছা, এমন কি হইতে পারে না যে, আমার উপরে তোমাদের উভয়ের বিষদৃষ্টি ছিল বলিয়া তুমি আমাকেই অকারণ হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছ ?

কমলিনী। না, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। আমি আপনার বিপক্ষে সাজিয়ে কোন প্রকার মিথ্যাকথা বলি নাই। আপনার দণ্ড হয়, এমন ইচ্ছাও আমার নয়, তবে আদালতের সম্মুখে হলপ্ করিয়া আমি মিথ্যাকথা বলিতে পারি না বলিয়াই যাহা প্রকৃত ঘটনা, যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি বা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, সেইগুলিই যথাযথ বলিয়াছি।

যজ্ঞেশ্বর। আচ্ছা, আমি যখন রোষভরে হেমাঙ্গিনীর কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসি, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি বাঁচিয়া থাকিতে কখনও তাহা হইবে না। আমি মরিয়া গেলে তুমি বাঁচ, আমি এত শীঘ্র মরিতেছি না! খুন না করিলে আমি সহজে তোমায় ছাড়িতেছি না! তুমি মনে করিতেছ, নির্ব্বিঘ্নে আমার বাপের বিষয় ভোগ করিবে, তাহা তুমি মনেও স্থান দিও না।' এ সকল কথা তুমি স্পষ্ট শুনিয়াছিলে ?

কমলিনী। হাঁ, এ সকল কথা আমি স্পষ্ট শুনিয়াছিলাম।

যজ্ঞেশ্বর। তুমি অধিক রাত্রে আমায় পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে চোরের মত বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে দেখিয়াছিলে, এ কথা কি সত্য ?

কমলিনী। হাঁ।

যজ্ঞেশ্বর। তুমি নিশ্চয় বলিতে পার, সে লোক আমিই, আর তুমি আমাকে ভিন্ন অন্য লোককে দেখ নাই ?

কমলিনী। হাঁ, আমি আপনাকে স্পষ্ট দেখিয়াছিলাম।

যজ্ঞেশ্বর বাবু যেন কতকটা ঘৃণার সহিত—যেন কতকটা বিরক্তভাবে বলিলেন, "তোমায় জিজ্ঞাসা করিবার আর আমার কিছুই নাই।"

এই সময়ে আদালত ভঙ্গ হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র হইতে অনূদিত

"বিগত কল্যের মোকদ্দমার বিবরণী।" শীর্ষক যে বিস্তৃত প্রবন্ধ, পরদিন দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত হইল ;—

"গত কল্য রাত্রি দশ ঘটিকার সময়ে স্ত্রী হত্যাপরাধে অপরাধী শ্রীযজ্ঞেশ্বর মিত্রের মোকদ্দমার অতি অন্যায় ও আশ্চর্য্যজনক নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। এই মোকদ্দমায় সাধারণের যে কত আগ্রহ হইয়াছিল, তাহা আদালতে বহু সংখ্যক লোকের জনতা দ্বারা বিশেষ প্রতীয়মান হইয়াছিল। শুনা যায়, স্থানাভাবে অনেক ভদ্রলোক পিয়াদাগণের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিয়াছিলেন।

"পরশ্বঃ দিবস সন্ধ্যার সময়ে আসামীর বিপক্ষের সমুদায় সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা শেষ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং গত কল্য সকলেই আসামীর সাফাই শুনিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিল।

"বন্দী যজ্ঞেশ্বর মিত্র, জজ ও জুরিগণকে যথারীতি সম্বোধন করিয়া আত্মপক্ষসমর্থন করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। আসামী পূর্ব্ব হইতে যে ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন ও যেরূপে তিনি আপনার পক্ষসমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। বন্দী বিচারপতি ও জুরিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—

"'আমার বিরুদ্ধে যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহারা সকলেই তাহাদের নিজের বিবেচনায় যথাযথ বিবরণ বিবৃত করিয়াছে। কেহই বিদ্বেষ বা

ঈর্ষার বশীভূত হইয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকে গুরুতর করিতে প্রয়াস পায় নাই। তবে যাহাদের উক্তিতে দুই-একটি সত্যের অপলাপ হইয়াছে বা যাহা দুই-একটি অনৈক্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভ্রম বশতঃই হইয়াছে বলিতে হইবে। আর আমার স্ত্রী হেমাঙ্গিনীর সহচরী কমলিনী ত আমার বিপক্ষে বলিবেই। কারণ তাহাদের উভয়ের মধ্যে কেহই আমায় ভালচোখে দেখিত না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে থাকিয়া বোধ হয়, কমলিনীরও এ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, আমি অত্যন্ত দুর্বৃত্ত। কাজে-কাজেই তাহার যেমন বিশ্বাস, সে তেমনই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে।

"'মনুষ্য অবস্থার দাস। ঘটনাক্রমে অদৃষ্টচক্রে নানা বিভীষিকা দর্শন ও ভোগ করিতে হয়। তাহাই গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ আমি আজ নির্দ্দোষ হইয়াও দোষীরূপে সাধারণ্যে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতেছি; কিন্তু ইহা জগতের ইতিহাসে প্রথম বা অভিনব নয়। এইরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে ও ভবিষ্যতে যে ঘটিবে না, তাহাও নহে।

"'উপস্থিত অভিযোগে আমার সম্ভ্রম ও আমার মর্য্যাদা এরূপভাবে বিজড়িত যে, আমার কোন উত্তর না দেওয়াই কর্ত্তব্য। আরও, আমার অধিক বলিবারই বা কি আছে? আমার বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষ্যসমূহ আমাকে নিশ্চয়ই ভীষণ পাতকী বলিয়া সাব্যস্ত করিবে। তবে সেই সর্ব্বদ্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ বিচারক জগদীশ্বরের সমক্ষে আমি নির্দ্দোষ। আমার বর্ত্তমান বিচারকগণকে আমি কেবলমাত্র ইহাই বলিব যে, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং আমার বিচারপতিগণের মত আমিও এই হত্যাসম্বন্ধে একেবারে অসম্পৃক্ত।

"'আমার সাপক্ষে আমি এইমাত্র বলিব যে, আমার চরিত্র ও আচার-ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিলে অনেকেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, এরূপ মহা পাপ আমার দ্বারা হয় নাই। শুনিয়াছি, দণ্ডলাঘবের জন্য অনেক

সময়ে অপরাধীরা আপনাপন চরিত্রের সততা সপ্রমাণ করিতে সচেষ্ট হয়; আমার উদ্দেশ্য তাহা নহে। কারণ সেরূপ করিতে যাইলেই প্রমাণ হইল যে, আমি দোষী, নতুবা দণ্ডার্হ হইব কেন? আমার বিচারকগণ আমার এই বাল-সুলভ যুক্তি, তর্ক শুনিয়া হাস্য করিতে পারেন; কিন্তু আমি ইহা ভিন্ন আর কি বলিব? বিধাতা আমার প্রতি বিষম বিমুখ।

"'আমি ও আমার স্ত্রী যে পরস্পর বিশেষ মনোমালিন্যের সহিত কালযাপন করিয়াছি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি আমার এই জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও উচ্চকণ্ঠে বলিব যে, আদালতে সাধারণ জনগণের সম্মুখে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কুলকাহিনী প্রকাশ করা অতীব অন্যায়। আর উকীল ব্যারিষ্টারগণেরও এইরূপ কুলকাহিনী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা আছে কি না, সে বিষয়েও আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। বর্ত্তমান বিপদ্ অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেও আমি এই মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে বিচারাধীন করিব না, এবং তাঁহাদের বংশমর্য্যাদার হানিকর গুপ্ত কুলকাহিনী সাধারণ্যে উপস্থিত করিয়া তাঁহাদিগকে অপমানিত করিব না।

"'আমার যে কি দণ্ডবিধান হইবে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আপনাদিগকে নিন্দা করা অতিশয় নীচের কর্ম্ম। কারণ যদি আমি আজ বিচারপতি হইতাম ও আপনারা আমার ন্যায় আসামী বলিয়া গণ্য হইতেন, তাহা হইলে আমিও আপনাদের ন্যায় এইরূপই বিচার করিতাম; কিন্তু ইহাও স্থির জানিবেন যে, যদিও আপনারা আইনের চক্ষে দোষীর দণ্ড বিধান করিতেছেন—ঈশ্বরের চক্ষে আপনারা নিরপরাধের দণ্ড দিতেছেন। অধিক আর কিছু আমার বলিবার নাই। যদি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র কীটের জীবননাশ করিলেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলেচ্ছা সুসাধিত হয়, তবে তাহাই হউক।'

"দায়রা আদালতে এরূপ নূতন ধরণের তর্ক-প্রণালী ইতিপূর্ব্বে আর কখন শ্রুত হয় নাই। আসামীর বিপক্ষের অভিযোগ অতি গুরুতর হইলেও তাঁহার আত্মপক্ষসমর্থনের যুক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু আসামীর এই কাতর অথচ নির্ভীক বক্তৃতায় অনেকের হৃদয়ের অন্তস্তলে সহানুভূতির স্রোত বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। সুতরাং তাঁহার কথা শেষ হইলেই আদালত গৃহের সকলেই তাঁহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, এবং নানামতে তাঁহার অন্তরে আশা ও ভরসা সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

"'কিয়ৎকাল নিস্তব্ধতার পর কোম্পানী-পক্ষের ব্যারিষ্টার—আসামীর বিপক্ষে অভিযোগ বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিবার জন্য উত্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে আসামীর করুণোক্তিতে দর্শকগণের অন্তঃকরণে যে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল, বিচক্ষণ ব্যারিষ্টারের কুট যুক্তিস্রোতে তাহা ভাসিয়া গেল। ব্যারিষ্টারের বক্তৃতা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল;—

"'বর্ত্তমান মোকদ্দমায় আমার বক্তৃতা যে বিশেষ বিস্তৃত হইবে, তাহা বিবেচনা করিবেন না। আসামীর বিরুদ্ধের সাক্ষীগণের এজেহারেই তাঁহার পাপের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং মোকদ্দমা আর জটিল নাই, অপেক্ষাকৃত সরল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার কর্ত্তব্য, আমি যথারীতি পালন করিব, এবং পালন করিতে যাইয়া কাহারও প্রতি কঠিন বা অমানুষিক ব্যবহার করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

"'সাক্ষিগণ সকলেই আসামীর অপরাধ-প্রমাণোপযোগী ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। আসামীও এই সাক্ষীর জবানবন্দীর বিরুদ্ধে দুই-এক স্থল ব্যতীত কোন কথা বলেন নাই; সুতরাং তাহাদের সাক্ষ্যে যে কোন অপ্রকৃত কথা নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আসামী বক্তৃতায় অস্পষ্টভাবে আরও কতকগুলি লোকের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া-

ছেন ; কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধেও তিনি কোন কথা বলিতে বা আদালতকে কোনরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। আর তিমি বলিয়াছেন যে, সাক্ষিগণের জবানবন্দীরও কতকগুলি অংশ সম্বন্ধে সত্যের অপলাপ হইয়াছে , কিন্তু সে সকল স্থলের বিশেষ উল্লেখ করেন নাই।

"'আসামী সাক্ষিগণের সাক্ষ্যে যে সকল কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন ; কিন্তু স্পষ্টরূপে যাহা অস্বীকার করেন নাই, সেই বিষয় আমি এখন জজ ও জুরিগণের বোধার্থ আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

"'প্রথমতঃ আল্‌ষ্টার কোট সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, যেদিন আসামীর কোচ্‌ম্যান খোদাবক্স তাঁহাকে গাড়ী করিয়া সহরের নানা স্থানে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছিল, সেইদিন তিনিই ঐ আল্‌ষ্টার পরিয়াছিলেন ; এ কথা আসামী অস্বীকার করিতেছেন না। তিনি কোচ্‌ম্যানের সাক্ষ্যের বিষয়ে এই প্রশ্ন করিতেছেন যে, যখন তিনি ঠন্‌ঠনের হোটেল হইতে বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিলেন ও যখন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে বাড়ীতে পৌছিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন, তখনও তাঁহার অঙ্গে সেই আল্‌ষ্টার কোট ছিল কি না ? কোচ্‌ম্যানের সাক্ষ্যে এরূপ প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারিলাম না, তবে আমার এইরূপ মনে হইতেছে যে, আসামী জজ ও জুরিগণকে এরূপ বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে, বারটা বাজিতে দশ মিনিট পূর্ব্বে যে ব্যক্তি গাড়ীতে উঠিয়াছিল, সে অন্য কেহ হইবে এবং আসামীর সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীর নিকটে গাড়ীতে নামিয়া বাড়ীর দরজা খুলিয়াছিল, তিনিও আমাদের সম্মুখের এই আসামী নহেন। আচ্ছা, তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিলাম, আসামীর এইরূপ যুক্তি সত্যমূলক, তবে আসামী এখন বলুন দেখি, পঁচিশে আষাঢ় রাত্রি বারটা বাজিতে দশ মিনিট হইতে ছাব্বিশে আষাঢ় প্রাতঃকাল

সাতটা পর্য্যন্ত তিনি কোথায় ছিলেন, আর কি করিয়াছিলেন? নিশ্চয় এই সময়ের মধ্যে কোন-না-কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবে। যদি এরূপ কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী স্বরূপে আদালতে উপস্থিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কথা কতকটা সত্য বলিয়া বোধ হইত; এবং তিনি যে ঘটনাক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিলেন, তাহারাও কতকটা প্রমাণ পাওয়া যাইত। আমার মতে যদি এরূপ কোন ব্যক্তি আদালতে আসিয়া সাক্ষ্য দিত, তাহা হইলে কোন জজ এবং জুরী আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারিতেন না। কারণ বস্তুতঃ তাহা হইলে ইহাই সপ্রমাণ হইত যে, পঁচিশে আষাঢ় বেলা এগারটার পর হইতে ছাব্বিশে আষাঢ় প্রাতঃকাল সাতটা পর্য্যন্ত আসামী ও তাঁহার স্ত্রীর পরস্পর সাক্ষাৎ হয় নাই এবং যখন এই সময়ের মধ্যে হতভাগিনী হেমাঙ্গিনীর মৃত্যু হইয়াছে, তখন আসামীর সে ক্ষেত্রে উপস্থিতি একরূপ অসম্ভব হইত। সুতরাং আসামীও নিরপরাধ সপ্রমাণ হইত। এরূপ সাক্ষী যথার্থ থাকিলে তাহা আদালতে উপস্থিত করা অতিমাত্র সহজ হইত; কিন্তু যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার আগমন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং তাহাকে উপস্থিত করিবার চেষ্টার কথা দূরে থাক্, আসামীর বক্তৃতায় তাহার উল্লেখ মাত্র নাই। ইহা হইতে বিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আসামী এইরূপে কোচ্‌ম্যানের সাক্ষ্য বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া বৃথা সন্দেহ উত্থাপন করিতে যত্ন করিতেছিলেন। বিপদ্‌সাগরে বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ায় তিনি তৃণ ধরিয়া ভাসিতে আয়াস পাইতে-ছিলেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

"'সাক্ষীগণের অন্যান্য জবানবন্দী সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই-এক কথা বলি-তেছি। এই সকল বিষয়ে আসামী নিজ বক্তৃতায় ইঙ্গিতে সন্দেহ প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু স্পষ্ট কোন কথা বলেন নাই। উদা-

হরণ স্বরূপ বলিতেছি ;—আসামী গোলদীঘী হইতে একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া লইয়া ঠনঠনের হোটেলে যান। এই স্ত্রীলোকটিকে তিনি তথায় আহারাদি করিতে অনুরোধ করেন ; কিন্তু বস্তুতঃ উভয়েই ঐ আহারীয় সামগ্রীর এক রকম বিন্দু-বিসর্গও স্পর্শ করেন নাই। ইহা হইতে বেশ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, যদিও উভয়ে আহারের ভাণ করিয়াছিলেন, তথাপি তৎকালে তাঁহারা অন্য কোন বিষয়ে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। এই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে প্রমাণ ও সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা অকাট্য ; এবং এই স্ত্রীলোকটির অস্তিত্ব বিষয়েও সন্দেহ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। ইহা কোনরূপ উপদেবতা বা কল্পিত প্রাণী নহে, রক্তমাংসনির্ম্মিত শরীরধারিণী। পুলিস বিশেষ তদন্ত করিয়াও এই স্ত্রীলোকটির কোন সন্ধান করিতে পারেন নাই। ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, স্ত্রীলোকটি পাছে আসামীর সহিত ঘনিষ্ঠতা হেতু দাণ্ডত হয়, এই ভয়ে কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে। আসামীও তাহার অস্তিত্ব বা তাহার সহিত কয়েক ঘণ্টা একত্র অতিবাহিত করা বিষয়ে আপত্তি করেন নাই। আসামীই যদি প্রকৃত নির্দ্দোষই হইবেন, তবে এই স্ত্রীলোককে আদালতে আনিয়া তাঁহার দোষহীনতা সপ্রমাণ করিবার পক্ষে কি বিশেষ বাধা থাকিতে পারে? যদি সেই স্ত্রীলোকও নির্দ্দোষ হন, তবে আদালতে আসিয়া তাঁহার নিজের ও আসামীর নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলে কি ক্ষতি হইতে পারে?

"'আসামী তাঁহার সাফাইয়ে সম্ভ্রম ও মর্য্যাদার কথা বলিয়াছেন। এবং বোধ হয়, এই সম্ভ্রমবোধই তাঁহাকে তাঁহার পাপকর্ম্মের সাহায্যকারিণী স্ত্রীলোকটিকে বিচারাধীন না করিতে বলিয়া দিতেছে। এই সম্ভ্রমবোধেই তিনি তাঁহার সাফাইয়ে অভিনব ও নূতন তর্ক সমূহের অব-

তারণা করিয়াছেন ; কিন্তু এই মর্য্যাদাবোধ যদি তাঁহার হতভাগিনী স্ত্রীর প্রতি তিনি প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হইত।

" বিবাহের পর যজ্ঞেশ্বর বাবু ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ের মধ্যে যে বিশেষ প্রণয় বর্ত্তমান ছিল না, তাহা ইতিপূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে সকলেই বেশ অনুমান করিয়াছেন যে, আসামীর অর্থলালসাই এই পরিণয়ের মূল অভিপ্রায় ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুতে যে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবেন, ইহাও তিনি জানিতেন ; সুতরাং হেমাঙ্গিনীকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যও দেখা যাইতেছে। পাপের ইতিহাসে অর্থলোভে আপনার স্ত্রীকে হত্যা করার যথেষ্ট উদাহরণও রহিয়াছে।

"'যজ্ঞেশ্বর বাবু একজন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি নিজের বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারিতেছেন। বাহিরে তিনি যতই গাম্ভীর্য্য দেখান না কেন, তাঁহার হৃদয়ে যে বিষম অনুতাপানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"'আমার আর অধিক কিছু বলিবার নাই। তবে মহামান্য জুরিগণের প্রতি আমার এই বিনীত নিবেদন যে, যজ্ঞেশ্বর বাবুর করুণোক্তিতে তাঁহারা যেন ন্যায় ও কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচলিত না হন। ন্যায় ও কর্ত্তব্য কঠিন হইলেও প্রতিপালন করা অতিশয় আবশ্যক। গৃহীত সাক্ষ্য দ্বারাই বিচারের ফলাফল নির্ণয় করা উচিত ; সুতরাং এই মোকদ্দমায় সাক্ষিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিলে একটিমাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সেই সিদ্ধান্তানুসারে যাহাতে অপরাধীর দণ্ডবিধান হয়, ইহাই আইন প্রার্থনা করে। আশা করি, ন্যায়বিধাতা জজ ও জুরিগণ আমার যুক্তির যাথার্থ্য ও সাফল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন।'

"কোম্পানীর পক্ষের ব্যারিষ্টারের বক্তৃতার পর জুরিদিগকে যথা-

রীতি সম্বোধন করিয়া বিচারপতি বলিতে লাগিলেন, 'মহাশয়গণ, উপস্থিত মোকদ্দমায় আপনারা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক রায় দিবেন। যে পর্য্যন্ত না আপনাদের মনে আসামীর অপরাধ বা অপরাধশূন্যতা বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন মতামত প্রকাশ করিবেন না। সময়ে সময়ে সাক্ষ্য-বৈচিত্র্যে নির্দ্দোষেরও দণ্ড হইতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু এরূপ উদাহরণ অতি অল্প। আবার এই সাক্ষ্য-বৈচিত্র্য দ্বারা মহা মহা পাতকীও উপযুক্ত দণ্ডভোগ করিয়াছে। সুতরাং যে সকল মোকদ্দমায় এই সাক্ষ্য-বৈচিত্র্য উপস্থিত হয়, সে স্থলে বিশেষ গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য করিতে হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে আপনারা এরূপ ভাবে বিচার করিবেন, যেন পরে অনুতাপানলে কাহাকেও দগ্ধ হইতে না হয়। কর্ত্তব্যজ্ঞান যেন আপনাদের সহায় হয়।'

"সাড়ে তিন ঘটিকার সময়ে জুরিগণ আপনাদের গৃহে প্রবেশ করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সকলেই মনে করিয়াছিলেন, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি শুনিতে পাইবেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু নতনেত্রে কাটগড়ায় বসিয়াছিলেন, একবারও কোনদিকে চাহিয়া দেখেন নাই। বোধ হইতেছিল, যেন তিনি আপনার আশু বিপদের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

"ক্রমে চারিটা, পাঁচটা, ছয়টা বাজিয়া গেল। আদালতের ব্যক্তিমাত্রেই উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিতে পারিলেন, জুরীদিগের মধ্যে মতের ঐক্য হইতেছে না। ছয়টা বাজিয়া বিশ মিনিট অতীত হইলে জুরিগণের অগ্রণী আদালতে আসিয়া জজ সাহেবকে জানাইলেন, জুরীদিগের মতের একতা হইতেছে না।

"জজ। আইন সম্বন্ধে কোন কূটতর্ক উপস্থিত হওয়াতে কি আপনাদের মতের এইরূপ অনৈক্য হইতেছে ?

"জুরীর মুখপাত্র বলিলেন, 'না, ধর্ম্মাবতার

"জজ। সাক্ষ্য-সম্বন্ধে কি মত-বিরোধ ঘটিয়াছে ?

"জুরী-মুখপাত্র। না, আমাদের মতের অনৈক্যের কোন বিশেষ কারণ নাই, কিন্তু তথাপি আমরা সকলে এক মত হইতে পারিতেছি না।

"জজ। এই দীর্ঘ ও গুরুতর বিচারের পর আমি আপনাদিগকে সহজে আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিতে পারিতেছি না। আপনি পুনরায় আপনার সহকারিগণের সহিত এ বিষয়ে বিশিষ্টরূপে বিচার করুন। আপনাদের অভিমত জানিবার জন্য আদালত আজ না হয় বিলম্বে বন্ধ হইবে।

"ক্রমে সাতটা, আটটা, নয়টা বাজিয়া গেল; তথাপি জুরীর মুখপাত্রের দেখা নাই। তখন বিচারপতি কথঞ্চিৎ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাত্রি সার্দ্ধ নয় ঘটিকার সময় জুরিগণের মুখপাত্র ফিরিয়া আসিলে, বিচারপতি জিজ্ঞাসা করেন, 'কি মহাশয়, এবার আপনাদের মতের মিল হইয়াছে ?'

"জুরীর মুখপাত্র। না ধর্ম্মাবতার! রায় সম্বন্ধে আমাদের সকলের এক মত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

"জুরিগণের মধ্যে এইরূপ মতভেদ দেখিয়া স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর বাবু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি আদালত ভঙ্গ হইলে জুরিদিগের মুখ দেখিবার জন্য কাটগড়া হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন।

"জজ সাহেব আদালত বন্ধ করিতে আজ্ঞা দিয়া জুরিগণকে বিদায় দিলেন। এই আশ্চর্য্য হত্যা মোকদ্দমার এই পর্য্যন্ত নিষ্পত্তি হইয়া রহিল, ফল জানিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব রহিলাম।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তারের খবর

মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল না, দেখিয়া ব্যারিষ্টার নিকলাস সাহেব হরিদাস গোয়েন্দাকে সেই রাত্রে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করেন। নিকলাস সাহেবের স্থির বিশ্বাস যে, যজ্ঞেশ্বর বাবুর দ্বারা কখনই এ হত্যাকাণ্ড সমাহিত হয় নাই। সেই বিশ্বাসবলেই তিনি আদালতে যজ্ঞেশ্বর মিত্রের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। সেইদিন রাত্রি দশটার সময়ে নিকলাস সাহেব হরিদাস গোয়েন্দা ও নিকলাস সাহেবের একজন ডাক্তার বন্ধু অম্বিকাচরণ সান্যাল এই তিনজনে নিকলাস সাহেবের বাটীতে একত্র হইয়াছিলেন। নিকলাস সাহেবের ইচ্ছানুসারেই হরিদাস গোয়েন্দা সেদিন সেখানে আসিয়াছিলেন। নিকলাস সাহেব তাঁহার দ্বারাই যজ্ঞেশ্বর বাবুর স্ত্রীর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করাইতে ইচ্ছা করেন; তাহাই আজ এই হত্যাকাণ্ডের কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য তিন জন একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন।

অম্বিকা। দেখ, এই যজ্ঞেশ্বর বাবুর মোকদ্দমাটা আগাগোড়াই রহস্যপূর্ণ। ইহার নিষ্পত্তিও সেইভাবে হইয়াছে। আমার বোধ হয়, যখন এ মোকদ্দমা আবার উঠিবে, তখন আর জুরীদের মধ্যে মতভেদ থাকিবে না। আর তখন যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিশ্চয়ই ফাঁসী বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইবে।

নিকলাস সাহেব এই কথা শুনিয়া একটু চিন্তান্বিত ভাবে বলিলেন, "সাক্ষী-সাবুদের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তোমার সিদ্ধান্ত ঠিকই হই-

য়াছে। ইহা ছাড়া যদি আর কিছু নূতন সাক্ষ্য আদালতে উপস্থিত না করা যায়, তাহা হইলে যজ্ঞেশ্বর বাবুর দণ্ডভোগ নিশ্চয় ; কিন্তু তুমি যে বলিতেছ, এই মোকদ্দমায় একটা জটিল রহস্য আছে, আমারও বিশ্বাস সেইরূপ। সেই রহস্যটা যদি কোন রকমে ভেদ করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয়, মোকদ্দমার ফল ও নিষ্পত্তি অন্যরূপ হইবে। রহস্য বড় সহজ নয়। এ রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিতে যাওয়া অনেকে পাগলামী বলিয়া মনে করিবে ; কিন্তু এমন একটা সামান্য সূত্র হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়িতে পারে যে, তখন সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে। যাহা হউক, যজ্ঞেশ্বর বাবুর মোকদ্দমা আর এক মাসের মধ্যে আদালতে উঠিবে না। এই এক মাসের মধ্যে আমার ইচ্ছা ও একান্ত অনুরোধ যে, হরিদাস বাবু এমন কোন সূত্র বা সাক্ষ্য বাহির করেন, যাহাতে যজ্ঞেশ্বর বাবুর নির্দ্দোষতা সম্পূর্ণ সপ্রমাণ হয়।"

হরিদাস। আমারও বিশ্বাস যে, ইহাতে একটা গূঢ় রহস্য আছে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবুকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিতে যত্ন করিতেছি ও করিব। আমাকে বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে হইবে না।

অম্বিকা। যজ্ঞেশ্বর বাবুর ভাবভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয় যে, তিনি যেন মোকদ্দমার ফলাফলের জন্য বিশেষ উৎসুক বা আগ্রহান্বিত নন। ভাল হউক, আর মন্দই হউক, তিনি যেন তাহা গ্রাহ্য করিবেন না, বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ ভাবটা কেন হইল, বুঝিতে পারিতেছেন কি ?

হরিদাস। আমার বোধ হয়, তিনি নির্দ্দোষ, তাই তাঁহার মনে শান্তি আছে। ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন, অদৃষ্টে যাহা হয় হইবে।

নিকলাস। তিনি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, সে বিষয়ে আমার মনে

একটুও সন্দেহ নাই। আমার মনে হয়, তিনি ইচ্ছা করিলেই আপনাকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিতে পারেন; কিন্তু তাহা করিতে হইলে তাঁহাকে হয় ত এমন কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হয় যে, সেগুলির সাহায্য লইতে তিনি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ ইচ্ছুক নহেন। কেন আপনারা কি লক্ষ্য করেন নাই যে, মোকদ্দমা সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় যেন তিনি আগাগোড়া ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন? তাঁহার যেন ইচ্ছা নয় যে, সে সম্বন্ধে কোন কথা আদালতে উঠে।

অম্বিকা। হাঁ, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি; কি এমনও ত হইতে পারে যে, এই সকল কথা আদালতে উঠিলে তাঁহার দোষ সম্পূর্ণ সপ্রমাণ হইয়া পড়ে; এই ভয়েই হয় ত তিনি সেগুলি গুপ্তভাবে রাখিতে যত্ন করিতেছেন।

নিকলাস। না, তাহা কখনই নয়। কেমন হরিদাস বাবু! আপনার এ সম্বন্ধে মত কি?

হরিদাস। আমার বোধ হয়, যে সকল গুপ্তকাহিনী প্রকাশ করিতে যজ্ঞেশ্বর বাবু অনিচ্ছুক, তাহাতে এমন কিছু নাই, যাহাতে তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণ হয়। আমার ইচ্ছা, আমি এই বিষয়টির বিশেষ তদন্ত করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বেয়ে-চেয়ে দেখি। দুই-একটা সূত্রও আমি পাইয়াছি, তবে সম্পূর্ণ রহস্য ভেদ না করিয়া কিরূপে আদালতে সে সকল কথার অবতারণা করি?

নিকলাস। আমারও দুই-একটা বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। আপনি কি কি সূত্র পাইয়াছেন বলুন দেখি, আমার সঙ্গে আপনার মিল হয় কি না দেখি।

হরিদাস গোয়েন্দা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিলেন, "আমার দুইটি সূত্র আছে। তাহার মধ্যে একটি বড় অকিঞ্চিৎকর ও সামান্য।

সেটিতে কোন কাজ হইবে বলিয়া আমার বোধ হয় না। অপরটি প্রধান ও প্রয়োজনীয়—যদি কিছু হয়, তবে সেইটির দ্বারাই এই বিষম রহস্যের গুপ্তকাহিনী সকল প্রকাশ হইয়া পড়িবে।”

কথাটা শেষ করিয়া হরিদাস পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, যেন কোন একটা বিশেষ গুরুতর বিষয়ে তাঁহার চিত্ত আলোড়িত হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি পুনরায় বলিলেন, “কিন্তু এই প্রধান সূত্রের কোন মীমাংসা আমি এখনও করিতে পারি নাই। ইহার অর্থই বা কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই।”

অম্বিকা। আপনার প্রধান সূত্রটি কি শুনি ?

হরিদাস গোয়েন্দা চেয়ার হইতে উঠিয়া টেবিলের উপর হইতে এক জোড়া তাস লইলেন। তাহার পর উহাদের মধ্য হইতে একখানি বাছিয়া লইয়া অম্বিকাচরণের হস্তে প্রদান করিলেন।

অম্বিকাচরণ ও নিকলাস সাহেব উভয়েই প্রায় এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, “হরতনের নওলা।”

হরিদাস। হাঁ, এই হরতনের নওলা, যজ্ঞেশ্বর বাবুর আলষ্টার কোটের পকেটে ছিল, তাহা বোধ হয়, আপনাদের স্মরণ আছে।

অম্বিকা। এই কি আপনার প্রধান সূত্র নাকি ?

হরিদাস বলিলেন, “হাঁ, ইহাই আমার প্রধান সূত্র। আর এই সূত্রের দ্বারাই আমি এই স্ত্রী-হত্যা-রহস্য ভেদ করিব স্থির করিয়াছি।”

অম্বিকা। আপনি রহস্যের উপর রহস্য যোগ করিতেছেন, দেখিতেছি। বিষয়টি আরও অধিকতর বিস্ময়কর হইয়া দাঁড়াইতেছে ; কিন্তু সূত্র যে সামান্য, তাহাতে আমার বোধ হয়, কোন কাজই হইবে না।

নিকলাস। না হে অম্বিকা বাবু, তুমি বুঝিতে পার নাই। হরিদাস

বাবুর মতের সহিত আমার ধারণার বেশ ঐক্য হইয়াছে। বোধ হয়, বিচারের সময়ে যখন এই ভাবের কথা হয়, তখন তুমি আদালতে উপস্থিত ছিলে না।

অম্বিকা। না, আমি তখন আদালতে ছিলাম না বটে।

নিকলাস। তবে যাহা বলি, বেশ করে কান পাতিয়া শুন দেখি, তোমারও মনে আর এক রকম বিশ্বাস হইবে। যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাড়ীর বহির্দ্বারের চাবি ও এই তাসখানিই তাঁহার আলষ্টার কোটের পকেটে পাওয়া যায়। এই দুইটি জিনিষ ছাড়া তাহাতে আর কিছুই ছিল না। যখন এই দুইটি জিনিষের কথা আদালতে উঠিল, আর এই সম্বন্ধে সাক্ষ্য-সাবুদ গ্রহণ করা হইল, তখন আমি একদৃষ্টে যজ্ঞেশ্বর বাবুর মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া মনের ভাব স্থির করিব, মনে করিয়াছিলাম। এই দুইটি সর্ব্বনেশে জিনিষ যে, তাঁহার আলষ্টার কোটের পকেটে পাওয়া গিয়াছিল, এ কথা আমি জানিতাম, কিন্তু তিনি জানিতেন না। যখন দরজার চাবি তাঁহার নিকটে দেখান হইল, তিনি তখন কেবল একটু মুচ্‌কি হাসিলেন, কিন্তু বিস্মিত বা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না; কিন্তু যখন হরতনের নওলাখানি তাঁহাকে দেখান হইল, তখন তিনি অমনই চমকিতভাবে শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখে এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল। পরক্ষণে তিনি যেন হতভম্ব হইয়া গেলেন। তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া আমার বেশ বোধ হইয়াছিল যে, তাঁহার মনে বিষম ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। তাহাতেই আমার অনুমান হয় যে, তাসখানি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে তিনি কিছু জানিতেন। তাহাতেই বজ্রাহতের ন্যায় তিনি শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন।

অম্বিকা। তাঁহার মুখে তুমি ভয়ের চিহ্ন দেখিয়াছিলে, বলিলে না?

নিকলাস। তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া আমার মনে তাহাই হইয়া-

ছিল ; কিন্তু কেন যে তাঁহার মনে এইরূপ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার কারণ আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই ; কিন্তু তাঁহার আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্মিত হইবার অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ ছিল।

অম্বিকা। আচ্ছা, এই তাস সম্বন্ধে যজ্ঞেশ্বর বাবু আদালতে কি কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন ?

হরিদাস। এ বিষয়ে কেন, তিনি ত অন্য অনেক বিষয়েই প্রশ্ন করেন নাই। যে সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিলে সাক্ষীদের অনেক গলদ বাহির হইয়া পড়িত, তাহাও ত তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। এখনও কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না যে, এই হরতনের নওলা তাসখানি উপস্থিত ঘটনাসূত্রের একটি প্রধান সূত্র।

অম্বিকা। আচ্ছা ধর, যেন মনে করিলাম, এই হরতনের নওলা সম্বন্ধে তোমরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছ, তাহাই ঠিক, অর্থাৎ ইহা যজ্ঞেশ্বর বাবুর অজ্ঞাতসারে তাঁহারই পকেটে ছিল, আর এ বিষয় ইতঃপূর্ব্বে তিনি কিছুই জানিতেন না। সহসা দেখিয়া তাই চম্‌কে উঠিয়াছিলেন। একি হইতে পারে না, এ মিথ্যা কল্পনা ?

হরিদাস। মিথ্যা ! আমি সম্পূর্ণ সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, এই সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত। আর ইহাও আমি জোর করিয়া বলিতেছি যে, আদালতে তাসখানি বাহির করিবার পূর্ব্বে তাঁহার আলষ্টারের পকেটে ইহার অস্তিত্বের বিষয় যজ্ঞেশ্বর বাবু বিন্দুমাত্রও জানিতেন না, এ বিশ্বাস আমারও হইয়াছিল।

অম্বিকা। হয় ত কেউ তাসখানি তাঁহার পকেটে রাখিয়া দিয়াছিল।

নিকলাস। আমারও তাহাই বোধ হইতেছে। কিন্তু একখানা খেলিবার তাসের সঙ্গে সে হরতনের নওলাই হউক, আর ইস্কাবনের টেক্কাই

হউক, আর রুইতনের গোলামই হউক, একখানা সামান্য খেলিবার তাসের সঙ্গে এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের যে কি সূক্ষ্ম সম্বন্ধ আছে, তাহা নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ, এমন কি অসাধ্য বলিলেও চলে।

টেবিলের উপরে সবলে চপেটাঘাত করিয়া হরিদাস গোয়েন্দা বলিলেন, "সেই সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করাই ত আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহা নির্ণয় করিবার জন্যই ত আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি। অম্বিকা বাবু! আপনি জানেন না, কত সামান্য সূত্র থেকে কত ভয়ানক ভয়ানক রহস্য সকলের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

নিকলাস। হরিদাস বাবুর কথার মর্ম্ম অম্বিকা বাবুর চেয়ে আমি কতকটা বুঝিতে পারিব। কারণ আমাদের আইনাদিতেও কখন কখন সামান্য বিষয়ের দ্বারা কত গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যায়। ফৌজদারী মোকদ্দমায় অতি অকিঞ্চিৎকর সাক্ষীর দ্বারা কত সময়ে কত লোককে আসন্ন মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করা গিয়াছে। সাধারণের চক্ষে মূল ঘটনার সহিত যে সকল ঘটনার সম্পর্ক অতি দূরতম বলিয়া বোধ হয়, সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা আপনাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যে তাহাদের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ ও নিকট সংশ্রব নির্ণয় করেন এবং এইরূপে কত শত অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের সংঘটন প্রতিরোধ করেন।

অম্বিকাচরণ উপহাসচ্ছলে বলিলেন, "আর আপনারাও এই হরতনের নওলা থেকে এই হত্যাকাণ্ডের মীমাংসা করে সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন।"

তাঁহার কথা শুনিয়া বোধ হইল, তিনি নিকলাস সাহেব ও হরিদাস গোয়েন্দার কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছেন না।

হরিদাস গোয়েন্দা অম্বিকাচরণের কথা শুনিয়া একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই তাস হইতে আমি মোকদ্দমার গতি অন্যদিকে ফিরাইয়া

দিব। আর এই তাস রহস্য আমি কোন-না-কোন রকমে ভেদ করিবই করিব।”

অম্বিকা। আপনি দুইটা সূত্রের কথা বলিলেন না? তাহার মধ্যে যে-টি আপনি খুব প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহার কথা ত শুইয়া গেল। আচ্ছা, আপনি যে সূত্রটিকে বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন না, সেটি কি, বলুন দেখি।

হরিদাস। বলিতেছি শুনুন; জুরীরা একমত না হওয়াতে তাঁহাদের এ মোকদ্দমায় ছুটি দেওয়া হয়, ইহা ত আপনারা সকলেই বেশ বুঝিতে পারিতেছেন? যেমন সকল সংবাদই সংবাদপত্রে বাহির হইয়া পড়ে, তেমনই এ কথাও কিছু গোপন থাকিবে না। আপনারা দেখিবেন, দুই-একদিনের মধ্যেই সংবাদপত্রে নিশ্চয়ই এ খবর বাহির হইবে যে, কয়জন জুরী এ মোকদ্দমায় যজ্ঞেশ্বর বাবুর দিকে ছিলেন, আর কয়জন তাঁহাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করিয়াছিলেন।

অম্বিকা। আমি অনেক গুজব শুনিয়াছি।

নিকলাস। কিন্তু আমি এ বিষয়ে ঠিক খবর দিতে পারি। বারজন জুরীর মধ্যে এগারজন যজ্ঞেশ্বর বাবুকে দোষী সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর কেবল একজনমাত্র লোক তাঁহার সাপক্ষে ছিলেন। তর্ক-বিতর্ক, আইনের যুক্তি, সাক্ষীর জবানবন্দী প্রভৃতি তাঁহাকে অনেক দেখান—অনেক বোঝান হইয়াছিল; তথাপি তাঁহার অটুট বিশ্বাস হইতে কেহ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। এই একজন ব্যতীত আর সকলের চোখেই যজ্ঞেশ্বর বাবু দোষী প্রমাণিত হইয়াছিলেন। কোন রকমেই কেহ তাঁহাকে বুঝাইতে পারেন নাই—কিছুতেই তিনি আপনার গোঁ ছাড়েন নাই। তিনি না কি এ পর্য্যন্তও বলিয়াছিলেন, ‘আপনারা আমায় বৃথা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। আমার স্থির

বিশ্বাস, যজ্ঞেশ্বর বাবু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। এ বিশ্বাস, আমার কিছুতেই টলিবার নহে। আপনারা তাঁহাকে দোষী বলিতে হয়, বলুন; কিন্তু কিছুতেই আমি নিমিত্তের ভাগী হইতে পারিব না।'

অম্বিকা। ইহাঁতে কিছুদিন দেরী হইবে বটে, কিন্তু তা বলিয়া যে, বড় বিশেষ সুবিধা হইবে, এমন ত আমার বোধ হয় না।

নিকলাস। সুবিধা হইতেও পারে। এমন অনেক ঘটনা পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, যাহাতে কালবিলম্বে বন্দীর পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়া গিয়াছে। হয় ত শেষে সে ব্যক্তি নির্দ্দোষ সপ্রমাণে মুক্তি পাইয়াছেন। একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে; সেটি প্রায় এই যজ্ঞেশ্বর বাবুর ঘটনার মত। অনেক দিন পূর্ব্বে এক মোকদ্দমায় ঠিক এই রকম ভাবে জুরী-দিগের মতের মিল হয় নাই। বন্দীর অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্য কোন প্রমাণ-প্রয়োগের অভাব ছিল না; কিন্তু সেবারেও এই রকম এক জন জুরী কোন রকমেই বন্দীর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন নাই। কাজে কাজেই বন্দীর পুনরায় বিচার হয়—আর সেই দ্বিতীয় বারের বিচারে, সে বেকসুর খালাস পায়। প্রথম বারের বিচারের দিন হইতে দ্বিতীয়বার বিচারের দিন পর্য্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহারই মধ্যে এমন সব নূতন প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছিল যে, বন্দীকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিতে আর কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। প্রথম দিনে যে জুরী বন্দীর সাপক্ষে ছিলেন, পরে জানা যায় যে, তিনি বন্দীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। যখন জুরিগণ নির্ব্বাচিত হন, তখন অবশ্য ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে পারেন নাই যে, বন্দীর সাপক্ষীয় কোন লোক জুরীদিগের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন; কেন না, তাহা জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাদ দেওয়া হইত। দ্বিতীয় দিনের বিচারের পর বন্দীর সেই বন্ধু সাধারণ-সমক্ষে প্রকাশ করেন যে, তিনি সাক্ষ্য-সাবুদ প্রভৃতি প্রমাণ প্রয়োগের

প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়াই কেবল বন্ধুতার খাতিরে বন্দীকে নির্দ্দোষ বলিয়াছিলেন।

অম্বিকা। তাহা হইলে তুমি বিবেচনা কর যে, যজ্ঞেশ্বর বাবুর মোকদ্দমায়ও জুরিদিগের মধ্যে সেইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছে?

নিকলাস। তুমি যদি জুরীদিগের মধ্যে থাকিতে, তাহা হইলে তোমার বিচারে কি হইত?

অম্বিকা। দোষী।

নিকলাস। তুমি জান, যদি আমি জুরীতে থাকিতাম, তাহা হইলে আমিও তাঁহাকে দোষী ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারিতাম না। যদিও আমার মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যজ্ঞেশ্বর বাবু অপরাধী নহেন; কিন্তু তথাপি এমন প্রমাণ প্রয়োগসত্ত্বেও আমি কোন ক্রমেই বলিতে পারিতাম না যে, তিনি নির্দ্দোষ। যখন জুরীদিগের মুখপাত্র বিচারপতির সম্মুখে আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, কোন ক্রমেই তাঁহারা একমত হইতে পারিতেছেন না, তখন যজ্ঞেশ্বর বাবুর মুখের দিকে কেহ চাহিয়া দেখিয়াছিলেন কি? তিনি নিজেই শুনিয়া যেন, আশ্চর্য্য হইলেন। জুরীরা যে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিবেন, বহুপূর্ব্ব হইতে তাঁহার সে ধারণা জন্মিয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের মতের মিল হইল না, শুনিয়া তিনিও অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। সাধারণতঃ আমরা কি দেখি? যে যথার্থ দোষী, সে যে রকম ভাবই প্রকাশ করুক না কেন, তাহার মুখে কেমন এক রকম চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সে ঘন ঘন জুরীদিগের মুখের দিকে চায়, তাঁহাদের মনে কখন কি ভাব উদয় হইতেছে, মুখের ভাব দেখিয়া তাহা জানিবার চেষ্টা করে। জুরীদিগের মুখপাত্রের মুখ হইতে শেষ কথা শুনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রভাব প্রকাশ করে; কিন্তু যজ্ঞেশ্বর বাবুর সে সব ভাব কিছু দেখিয়াছিলে কি? তিনি যেন পূর্ব্বা-

বধিই উদাসীন। জুরীদিগের নাম যখন পড়া হইল, তিনি তখনও যেরূপ ভাবে ছিলেন, পরেও সেই ভাবে তাঁহাকে দেখা গিয়াছিল। তিনি একবারও জুরীদিগের দিকে চেয়ে পর্য্যন্ত দেখেন নাই, সেদিকে লক্ষ্য করিয়াছিলে কি ?

অম্বিকা। তা সেটা অন্য কারণেও হইতে পারে। যজ্ঞেশ্বর বাবু শুধু চোখে ত দূরে ভাল দেখিতে পান না—তাই বোধ হয়, জুরীদিগের দিকে চাহিয়া দেখেন নাই। কেননা, দেখিলেও তিনি তাহাদের কাহাকেও চিনিতে পারিতেন না।

নিকলাস। তা আমি জানি ; কিন্তু তাঁহার চশমা তাঁহার গলাতেই ঝুলিতেছিল। দেখিবার ইচ্ছা হইলে তিনি অনায়াসেই দেখিতে পারিতেন ; কিন্তু দেখিবার ইচ্ছা তাঁহার একবারও হয় নাই। তাহার পর এই জুরীর নামের তালিকাখানা দেখ, ইহাদের মধ্যে একজন ছাড়া আমি সকলকেই জানি, সকলকেই চিনি। আর এই সব জুরীদের মধ্যে কে যজ্ঞেশ্বর বাবুর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও আমি বলিয়া দিতে পারি ; কিন্তু যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া আমি এই সব কথা বলিতেছি, তাঁহার বিষয় আমি কিছু জানি না। ইনি কোথায় থাকেন, তাহাও আমি বলিতে পারি না।

অম্বিকা। তুমি যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া এই সব কথা বলিতেছ, তাঁহার নাম কি ?

নিকলাস। রাধারমণ বাবু।

ঠিক এই সময় নিকলাস সাহেবের ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "হুজুর ! এইমাত্র একটা লোক এই টেলিগ্রামখানা নিয়ে এল। জবাবের জন্য সে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ক্ষিপ্রহস্তে নিকলাস সাহেব তাঁহার চাকরের নিকট হইতে টেলি-

গ্রামখানি লইয়া পাঠ করিলেন। হরিদাস গোয়েন্দা এবং ডাক্তার অম্বিকাচরণ তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া অবাক্ হইলেন।

নিকলাস সাহেব টেলিগ্রামখানি টেবিলের উপরে রাখিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এ রকম লোক ত আমি কখনও দেখি নাই। ইনি আগ্রা হইতে টেলিগ্রাম করিতেছেন। কি লিখিয়াছেন, আমি পড়ি, আপনারা উভয়ে শুনুন। মাননীয় ডগ্‌লাস্ সাহেব K. C. S. I. মহোদয়ের নিকট হইতে এ টেলিগ্রামখানা আসিতেছে। তিনি লিখিতেছেন ;—

"যজ্ঞেশ্বর বাবুর মোকদ্দমার বিবরণী যথাসময়ে এখানে তারের খবর হইয়াছে। এখানকার সংবাদ-পত্র সমূহে এ কথা প্রকাশিত হইয়াছে। নিশ্চয়ই যজ্ঞেশ্বর বাবুর মোকদ্দমা পুনরায় উঠিবে। যদি ইহার মধ্যে আপনি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম। আপনি যদি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এখনই বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হইতে দশ হাজার টাকা লইতে পারেন। আমি সেখানেও টেলিগ্রাফ করিলাম। এই দশ হাজার টাকার মধ্যে আপনার পাঁচ হাজার। আর পাঁচ হাজার টাকা লইয়া আপনি এই বিষয়ের খরচ-খরচা করিতে পারেন। এ ছাড়া আপনি সাধারণের নিকটে আপনার পারিশ্রমিক হিসাবে যে রকম লইয়া থাকেন, তাহাও আপনি আমার নিকট হইতে পাইবেন। আপনার যদি আবশ্যক হয়, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হইতে আপনি আরও অধিক টাকা গ্রহণ করিতে পারেন। যেরূপে হউক, যজ্ঞেশ্বর বাবুকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিতেই হইবে। ইহাতে যত টাকা ব্যয় হয়, আমি দিব। টাকার জন্য চেষ্টার যেন কোন ত্রুটি না হয়। এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেও যদি তিনি

অব্যাহতি পান, তাহা হইলে এক লক্ষ টাকা খরচ করিতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না। প্রতিদিন আপনার নিকট হইতে আমি দুইখানি পত্রের প্রত্যাশায় থাকিব।··কি করিতেছেন, কোথায় যাইতেছেন, কি রকম লোক নিযুক্ত করিতেছেন, কতটা সুবিধা হইতেছে, সব কথা আমি প্রতিদিন এখানে বসিয়া জানিতে ইচ্ছা করি। যজ্ঞেশ্বর বাবুকে বাঁচান সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভার গ্রহণ করুন। ইহার উত্তর-প্রতীক্ষায় আমি বসিয়া রহিয়াছি, জানিবেন। টেলিগ্রামের এক শত শব্দের মূল্য অগ্রিম দিয়া দিলাম। এক শত কথা পর্য্যন্ত আপনি উত্তর লিখিতে পারেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু জানিতে না পারেন যে, আমি তাঁহার হইয়া এই সব করিতেছি। ইহা কেবল আপনি এবং আমি জানিব। আর যদি কেহ জানিতে পারেন বা অন্য কাহাকেও জানাইবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাঁহাকেও সাবধান করিয়া দিবেন, যেন তিনি ঘুণাক্ষরেও এ কথা প্রকাশ না করেন। আমি আপনাকে একখানি পত্রও লিখিলাম। তাহাতে অনেক বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিবেন। রাধারমণ বাবুর নামে যে ব্যক্তি জুরীতে ছিলেন, তাঁহার কাছেও আপনি অনেক বিষয় সংগ্রহ করিতে পারেন। আমি তাঁহার ঠিকানা জানি না, কিন্তু ইহা আমি বেশ জানি যে, যজ্ঞেশ্বর বাবুর সহিত রাধারমণ বাবুর এক সময়ে বড় বন্ধুত্ব ছিল।”

টেলিগ্রামের কথা শুনিয়া হরিদাস গোয়েন্দা ও ডাক্তার অম্বিকাচরণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

তাহার পর অম্বিকাচরণ বলিলেন, “আশ্চর্য্য বটে! এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কখন দেখি নাই, এ ডগ্‌লাস সাহেবটি কে? বোধ হয়, সেই যে দিন-কতক সোনা রূপার খনি, কয়লার খনি প্রভৃতি নিয়ে সহরে

খুব হুলস্থূল বাঁধিয়েছিল—অজস্র পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন—সেই নাকি? সে যদি হয়, তাহা হইলে এরূপ রাশি রাশি টাকা খরচ করা তাহার পক্ষে কিছু আশ্চর্য্য নয় বটে। তুমি ডগ্‌লাস সাহেবের বিষয় কিছু জান?"

ডাক্তার অম্বিকাচরণ যে সময় কথা কহিতেছিলেন, সেই সময় নিক-লাস্ সাহেব তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামের উত্তর লিখিতেছিলেন। তাঁহার উত্তর লেখা সমাপ্ত হইলে অম্বিকাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আপনি কি স্থির করেছেন?"

নিকলাস। যা' স্থির করিয়াছি, তাহা এই উত্তরখানা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

ডাক্তার অম্বিকাচরণ উত্তরখানি লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন;—

"আপনার নিকট হইতে যে তারের খবর আসিয়াছিল, তাহা এই মাত্র পাইলাম এবং পাঠ করিলাম। আপনি যে কার্য্যে আমায় নিযুক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন, অতি সানন্দচিত্তে আমি তাহা গ্রহণ করিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যজ্ঞেশ্বর বাবু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং বোধ হয়, আপনার প্রতিশ্রুত অর্থ-বলে আমি অনায়াসে তাহা সপ্রমাণ করিতে পারিব। এই কার্য্যের জন্য হরিদাস গোয়েন্দা নামক ডিটেক্-টিভ পুলিসের একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারীকেও নিযুক্ত করিলাম। এই ঘটনার ভিতরে অনেক রহস্য আছে, সে রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে হরিদাস গোয়েন্দা ভিন্ন অপর কোন লোক পারিবেন না। সেইজন্য অনেক বিবেচনার পর তাঁহাকেই নিযুক্ত করা আবশ্যক বিবেচনা করি-লাম। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, সেইরূপই করিব। প্রতিদিন আপনাকে দুইখানি করিয়া পত্র লিখিব, আবশ্যক হইলে অতিরিক্ত পত্রও পাইবেন।"

টেলিগ্রামের উত্তরখানি পাঠ শেষ হইলে, নিকলাস্ সাহেব ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহার হাতে সেইখানি দিয়া বলিলেন, "যাও, যে লোকটি টেলিগ্রামের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহাকে এইখানা দাও।"

নিকলাস। দেখুন হরিদাস বাবু! ইহাতে আমায় আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইতেছে যে, ডগলাস্ সাহেবও আমায় সেই রাধারমণ বাবুর নিকটে খবর লইতে বলিতেছেন। আমি যাঁহাকে যজ্ঞেশ্বর বাবুর সাপক্ষীয় লোক বলে অনুমান করিয়াছি, ডগ্লাস্ সাহেব দূরে বসিয়া আভাসে তাহাই ইঙ্গিত করিতেছেন।"

হরিদাস। আশ্চর্য্যের কথা বটে—ইহার ভিতরে গূঢ় রহস্য আছে। তা' যাক্, আপনি যদি আমাকে এ কার্য্যে নিযুক্তই করিলেন, তাহা হইলে আমার উপরে কি কি কার্য্যভার প্রদান করিবেন, বলুন।

নিকলাস। আপনি এই রাধারমণ বাবুর বাসস্থান কোথায়, আগে সেইটি বাহির করুন।

হরিদাস। সে ত অতি সোজা কাজ। তাহাতে আর কত সময় লাগিবে? তাহার পরে কি করিতে হইবে, বলুন।

নিকলাস। তাহার পরে যাহা করিতে হইবে, তা আমি আপনাকে পরে বলিব—এখন আপাততঃ আর কিছু করিতে হইবে না।

হরিদাস গোয়েন্দাকে এই কথা বলিয়া নিকলাস্ সাহেব অম্বিকাচরণের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা ডাক্তার বাবু, বিষাক্ত ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন করাতে হেমাঙ্গিনীর মৃত্যু হইয়াছে, এ কথা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে না? নিদ্রার জন্য তিনি এই ঔষধ ব্যবহার করিতেন, আর অধিক মাত্রায় সেবন করিলে বিপদ্ ঘটিতে পারে, তাহাও তিনি জানিতেন, কেমন? যে গেলাসে করিয়া ঔষধ

সেবন করা হইয়াছিল, সে গেলাসটি তাঁহার বিছানার নিকটে পাওয়া যায় নাই—কিছু দূরে ছিল। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, হেমাঙ্গিনী কখনও আত্মহত্যা করেন নাই—কারণ তাহা হইলে গেলাসটা নিশ্চয়ই তাঁহার বিছানার নিকটে পড়িয়া থাকিত। আমার মতে সমস্ত ঘটনাবলী রীতিমত পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, যজ্ঞেশ্বর বাবুর দ্বারা এ হত্যাকাণ্ড কখনও ঘটে নাই।"

অম্বিকা। কই, আমি ত তোমার কথার ভাব কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

নিকলাস। বুঝিতে পারিলেন না? কেন, ইহা ত অতি সহজ কথা। মনে করুন, আমি যেন যজ্ঞেশ্বর বাবু, আমি স্থির করিলাম যে, বিষপান করাইয়া আমার স্ত্রীকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিব; অথচ মনে মনে এমন সকল ফন্দী আঁটিতে লাগিলাম যে, এই হত্যাকাণ্ডে যাহাতে আমার উপরে জনপ্রাণীর সন্দেহ করিতে না পারে, এমন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। রাত্রে আমি আমার স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করিলাম। দিনের বেলা যে ঝগড়া হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। আমার স্ত্রীও যেন আমার কথায় ভুলিলেন। তাহার পরে কথায় কথায় তিনি বলিলেন যে, তাঁহার নিদ্রা না হওয়াতে তিনি বড় ক্লেশ পাইতেছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, যদি কষ্ট হয়, তবে একটু ঔষধ সেবন কর না কেন? তিনি যেন তাহাতে আমায় ঔষধ ঢালিয়া দিতে বলিলেন; আমি সুবিধা পাইয়া এক দাগ ঔষধের পরিবর্ত্তে সমস্ত ঔষধ গেলাসে ঢালিয়া ফেলিলাম। তিনি সমস্ত ঔষধটি পান করিয়া আমার হাতে গেলাসটি ফিরাইয়া দিলেন। তাহার পর তিনি যে নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন, তাহা হইতে আর উঠিলেন না। আমি আমার চক্ষের সম্মুখে তাঁহার মৃত্যু দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম।

প্রতিদিন যে বাদ-বিসম্বাদ লইয়া কাল কাটাইতাম, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইলাম জানিয়া মনে আনন্দ হইল। খুন ত হইয়া গেল, তাহার পর আমি করিব কি? আমার সে অবস্থায় কি করা উচিত? মৃত্যুযন্ত্রণা—চীৎকার—ছট্‌ফট্‌ করা প্রভৃতি সকল প্রকার দায় হইতে ত নিষ্কৃতি পাইলাম, এখন করি কি? কেহ জানিবার বা আমার উপর সন্দেহ করিবার ত কোন কারণ রহিল না। অতি সুকৌশলে হত্যাকাণ্ড সমাহিত হইল—আমি ভিন্ন এ জগতে আর কেহ এ কথা জা না—বা ইহার প্রমাণ দিতে পারে না। আমি তখন কি করি জলের গেলাসটি, পাথরের কুঁজোটি, ঔষধের শিশিটি সমস্ত সরাই স্থানে রাখিলাম। মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলাম, ঐ গুলি সরা রাখিলেই কেহ বুঝিতে পারিবে না, কিসে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়া তাহার পরে আবার যেন আমার মনে হইল, জিনিষগুলি সরাইয়া ল হয় ত আত্মহত্যা বলিয়া প্রমাণিত না হইতে পারে। কাজেকাজেই অনেক চিন্তার পর সেগুলি আবার আমার স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে, টিপায়ের উপরে রাখিলাম। এখন আমার কথা বুঝিতে পারিলে?

অম্বিকা। কিছুই না। আমি যেন সমস্তই অন্ধকার দেখিতেছি। তোমার সকল কথাই যেন আমার আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

নিকলাস। তবে এখন থাক্—কাল আমি তোমাকে আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরদিনেই নিকলাস সাহেব, ডগ্‌লাস্ সাহেবের নামে নিম্নলিখিত পত্র-খানি প্রেরণ করেন ;—

"মহাশয় !

গত রজনীতে আমি আপনার টেলিগ্রাম পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছি। নিশ্চয়ই তাহা আপনি পাইয়াছেন। তাহাতেই দেখিতে পাইবেন যে, আপনি আমায় যে কার্য্যভার প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা আমি গ্রহণ করিয়াছি। আজ বেলা এগার-টার সময়ে আমি বেঙ্গল ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাঁহারা আমাকে তৎক্ষণাৎ ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা দিতে চাহিলেন। আমি আপনার টেলিগ্রামের লিখিত ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা লইলাম। তাঁহারা আমায় এ কথায় বলিলেন যে, যদি আমার বেশী টাকার আবশ্যক হয়, তাহাও আমি তাঁহাদের নিকটে আবেদন করিলে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রাপ্ত হইব। পরীক্ষার জন্য আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি ৮০,০০০৲ আশী হাজার টাকা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমি আবেদন করিবা-মাত্রই তাঁহারা আমায় তাহা দিবেন কি না ? তাঁহারা বলিলেন যে, আপনি সেই মর্ম্মেই তাঁহাদের প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ, যদিও আমি তাঁহাদের কিছু বলি নাই,

কিন্তু আপনাকে বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। এমন অনেক ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহাতে অর্থের দ্বারা গুপ্ত সংবাদ ক্রয় করিতে হইবে। অল্প বা অধিক পরিমাণে ঘুষ দিয়া হয় ত কাহারও কাহারও মুখ বন্ধ করিতে হইবে। আপাততঃ যদিও সেরূপ কোন আবশ্যক না হয় ; কিন্তু এ সকল কাজে দরকার পড়িলেও পড়িতে পারে ; সেইজন্য আপনাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে ইচ্ছা করি। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারীর কথা শুনিয়া সেইজন্য আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কৌশলে হউক, অর্থবলে হউক, যেমন করিয়াই হউক, আমি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে এ খুনী-মোকদ্দমা হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবই করিব। যাহাতে তিনি বেকসুর খালাস পান, সেজন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

বোধ হয়, আপনি না জানিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহা প্রকৃত ঘটনা বলিয়া, আপনাকে জানাইয়া রাখা আবশ্যক যে, এই ঘটনায় যজ্ঞেশ্বর বাবুকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিবার জন্য আপনার যতটা ঝোঁক, আমার আবার তদপেক্ষাও অধিক। আপনি যদি আমাকে অর্থবলে বলীয়ান্ করিবার সাহস প্রদান না করিতেন, তাহা হইলেও আমার নিজ ক্ষমতায় যতদূর হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহাও আমি করিতাম। সে পরিশ্রমের জন্য নিজ পারিশ্রমিক হিসাবে যদি আমি কিছু না-ও পাইতাম,তাহা হইলেও নিশ্চয়ই আমি এ মোকদ্দমা ছাড়িতাম না।

যজ্ঞেশ্বর বাবুর সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা আছে, জানিবেন। সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে আমি অনেক বিষয়ে উপকৃত হইয়াছি ; সুতরাং সে সকল উপকারের প্রত্যুপকার করিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল রহিয়াছে। তা' ছাড়া যজ্ঞেশ্বর বাবু যে এ ঘটনায় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, সে বিষয়ে আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে। আর সেই ধারণা

বলেই আমি স্ব-ইচ্ছায় তাঁহার মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়াছিলাম। যদি আমার মনে এই বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে এ কথা বলিলে বোধ হয়, আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না যে, আমি আপনার ন্যায় উদার প্রকৃতি লোকের অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াও এ কার্য্যে হস্ত প্রদান করিতাম না। মোকদ্দমায় আপনারও যতটা আগ্রহ, আমারও ততোধিক। স্বয়ং আমি এইরূপ বিপদে পড়িলে, আমার নিজ জীবন রক্ষা করিবার জন্য আমি যতটা চেষ্টা করিতাম, ইহাতেও সেইরূপ করিব, জানিবেন। সময় যদিও অতি সংক্ষেপ, তথাপি আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে, ইহারই মধ্যে আমি এই ঘটনার একটি সূত্র পাইয়াছি। সেই সূত্র ধরিয়াই আপাততঃ আমি কার্য্যে অগ্রসর হইব। যদিও সে সূত্র অতি সামান্য, যদিও সে সূত্রের উপরে এখনও তাদৃশ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না, কিন্তু তথাপি আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাহাতেই হয় ত এই গুপ্ত রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিব। আপনি যে প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, আমি সেই মতই আপনাকে পত্র লিখিব। আমার প্রতি পত্রে ঠিক গল্পের ন্যায় সমস্ত ঘটনা বর্ণিত থাকিবে, দেখিতে পাইবেন। অর্থের বিন্দুমাত্র অসদ্ব্যবহার হইবে না ; সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

আপনার পত্রে যে স্থলে আপনি রাধারমণ বাবুর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এই রাধারমণ বাবু সেদিন জুরীতে বসিয়াছিলেন। ইনি একজন খৃষ্টিয়ান এবং আচারে ব্যবহারে পুরা সাহেব। দ্বাদশ জন জুরীর মধ্যে কেবল ইনিই যজ্ঞেশ্বর বাবুকে নির্দ্দোষ বলিয়াছিলেন, ইহা আমি কোন গুপ্ত উপায়ে জানিতে পারিয়াছি। কেবল ইঁহারই জন্য সেদিন যজ্ঞেশ্বর বাবু রক্ষা পাইয়াছেন।

আমার প্রথম কার্য্য ইঁহার বাসস্থান ঠিক করা। সে বিষয়ে আপনি কিছু বলিতে পারেন নাই। যাহা হউক, যে হরিদাস গোয়েন্দাকে আমি এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ব্যক্তি বোধ হয়, ডিটেক্‌টিভ-ডিপার্টমেণ্টে আর কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাকেই আমি এই কার্য্যের ভার প্রদান করিয়াছি। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অনুসন্ধানের দ্বারা বাহির করিয়াছেন যে, উক্ত রাধারমণ বাবু পার্ক ষ্ট্রীটে থাকেন। হরিদাস গোয়েন্দা আমাকে এই সংবাদ প্রদান করিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ আমি পার্ক ষ্ট্রীটে রাধারমণ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হই। তিনি বাটীতেই ছিলেন—আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, "রাধারমণ বাবু! আমি আপনার সহিত বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আপনি যজ্ঞেশ্বর বাবুর মোকদ্দমায় একজন জুরী ছিলেন। আপনি হয় ত আমায় অনেক বিষয়ে এমন সংবাদ প্রদান করিতে পারেন, যাহাতে এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।"

রাধারমণ বাবুর বয়ঃক্রম প্রায় ষাট বৎসর হইবে। তাঁহার মুখ দেখিয়া তাঁহাকে দয়ালু লোক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার আকার-প্রকার দেখিয়াই আমার প্রথমে ধারণা হইয়াছিল যে, তাঁহার দ্বারা আমার বিশেষ উপকার হইবে।

তিনি প্রথমেই বলিলেন, "বড় দুঃখের বিষয় যে, যজ্ঞেশ্বর বাবু নিজ পক্ষ-সমর্থনের জন্য একজন ব্যারিষ্টারও নিযুক্ত করিতে সম্মত হয়েন নাই। জুরীতে যে কয়জন লোক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। ব্যাপার কি, অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই।"

আমি বলিলাম, "বাস্তবিকই এটি বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমার বোধ হয়, আপনি এ ঘটনার কারণ কতকটা অনুমান করিতে পারেন। সেই সাহায্য প্রাপ্তির জন্যই আমি আপনার কাছে'আসিয়াছি।"

আমার কথায় তিনি উত্তর দিলেন, "আমি আপনাকে কোন খবর দিতে পারি না—এ বিষয়ে আমি আপনাকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারি না।"

আমি। একটি কথা আমি আপনাকে বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারি কি?

রাধারমণ। পারেন, কিন্তু আপনাকে বলিবার আমার কিছুই নাই জানিবেন। এ বিষয় লইয়া আমি কাহারও সহিত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। সুতরাং আমার সহিত এ বিষয়ে কথোপকথনে আপনার কোন ফলোদয় হইবে না। আমার কোন কথা বলিবার যো নাই।

যদিও তিনি আমাকে বার বার ঐরূপ ভাবে নিরুৎসাহ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন—বার বার আমাকে বলিতেছিলেন যে, এ মোকদ্দমা সম্বন্ধে তাঁহার বলিবার কিছুই নাই—তথাপি তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছিল যে, তাঁহার বলিবার যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তিনি কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন না। হয় ত তিনি মনে করিলে অনেক কথা বলিতে পারিতেন।

যাহা হউক তিনি আমায় কোন বিষয়ে সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলেও, আমি তাঁহাকে সহজে ছাড়িতে পারিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার বোধ হয়, আপনি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচনা করেন?"

রাধারমণ বাবু যেন কতকটা বিরক্তির সহিত উত্তর করিলেন, "আমি আপনাকে এ বিষয় বলিতে বাধ্য নহি।"

এ কথায়ও আমি কোন প্রকার বিচলিত না হইয়া পুনরায় বলিলাম, "দেখুন, সকল কথা কিছু অপ্রকাশ থাকে না—বিশেষতঃ এরূপ বিষয়ের কথা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। হয় ত যে সকল কথা আপনি প্রকাশ করিবেন না ভাবিতেছেন, তাহা লইয়া এতক্ষণ সকল স্থানে আন্দোলন চলিতেছে। বোধ হয়, আপান এ কথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, বারজন জুরীর মধ্যে এগার জন যজ্ঞেশ্বর বাবুকে দোষী এবং কেবল এক জন জুরী তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়াছিলেন।"

রাধারমণ বাবু বলিলেন, "এ কথা জানিবার সাধারণের কোন অধিকার নাই ; আর ইহা যে কেহ জানিতে পারিবেন, তাহাও আমি বিশ্বাস করি না।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলাম, "আপনি মনে করেন যে, এ কথা সাধারণে জানিতে পারিবে না, কিন্তু আমি আপনাকে সত্যকথা বলিতেছি, ইহার মধ্যেই এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে যে, সেই এক-জন জুরী—যিনি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে নির্দ্দোষ বলিয়াছিলেন—তিনি আর কেহই নহেন, স্বয়ং আপনি।"

রাধারমণ বাবু আমার কথা শুনিয়া যেন কতকটা বিস্মিতের ন্যায় উত্তর করিলেন, "এ সকল কথা সাধারণে প্রকাশিত হওয়া উচিত নহে।"

আমি বলিলাম, "তা' না হইতে পারে ; কিন্তু যে কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই আমি আপনাকে বলিতেছি। যজ্ঞেশ্বর বাবুর মোকদ্দমা লইয়া সহরে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। তিনি মোকদ্দমায় যেরূপ অসাধারণ ব্যবহার করিয়াছিলেন ও যে প্রকার অন্যায় ও আশ্চর্য্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে জনসাধারণ যে বিশেষ বিচলিত হইবেন, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এ মোকদ্দমা লইয়া

দিন কয়েক যে বিশেষ আন্দোলন চলিবে, সে ধারণা আমার পূর্ব্বেই হইয়াছিল। যজ্ঞেশ্বর বাবু জীবন উপেক্ষা করিয়াও কোন বিষয় যে গুপ্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এ কথা বোধ হয়, বুদ্ধিমান্ লোকমাত্রেই অনুমান করিয়াছেন।"

রাধারমণ বাবু উত্তর করিলেন, "তাহা হইলেও জুরীদিগের গুপ্ত পরামর্শ কি হইয়াছিল, সাধারণের সে বিষয়ে আন্দোলন করাই উচিত নহে।"

আমি বলিলাম, "উচিত নহে, সে সকলেই জানে ; কিন্তু এই মোকদ্দমায় সাধারণের এত বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছে যে, তাহারা এই বিষয় আন্দোলন না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। আমি একজন লোক—আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি, যজ্ঞেশ্বর বাবু নির্দ্দোষ। এখন বলুন দেখি, আমার বিবেচনায় যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ, আমার চক্ষের সম্মুখে যদি তাঁহার প্রতি অন্যায় বিচার করা হয়, তাহা হইলে আমার মন বিচলিত হয় কি না ?"

কথায় বাধা দিয়া রাধারমণ বাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বলুন দেখি, আপনি যদি জুরীতে বসিতেন, তাহা হইলে আপনি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে নির্দ্দোষ বলিতেন কি না ?"

তিনি যেরূপ ব্যগ্রতার সহিত আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে আমাকে বিশেষ ভাবিয়া-চিন্তিয়া উত্তর প্রদান করিতে হইল। আমি বলিলাম, "আমি জুরীতে বসিলে কি বলিতাম, তাহা এখন আপনাকে ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। তাঁহার বিরুদ্ধে এই সকল অকাট্য প্রমাণ-প্রয়োগ দেখিয়াও আমি কি করিতাম, তাহা জানি না। এখন আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। যজ্ঞেশ্বর বাবুর সহিত আপনার কোন সময়ে কি বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল ?"

এই কথায় রাধারমণ বাবু বিশেষ বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ কথা বলে ?"

আমি বলিলাম, "কেহ এ কথা বলেন কি না, তাহা আমি বলিতেছি না ; আমি আপনাকে এ কথা শুধু জিজ্ঞাসা করিতেছি মাত্র। আর এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কারণও আমার আছে। মনে করুন, কোন কারণে কোন সময়ে যজ্ঞেশ্বর বাবুর সহিত আপনার বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল, আর সেই অবধি আপনার ধারণা এই যে, তিনি একজন বড় ভাল লোক। সেই ধারণা-বলে, জুরীতে বসিয়া তাঁহার বিপক্ষে বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ-সত্ত্বেও আপনার তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলা কি সম্ভব ?"

আমার কথায় রাধারমণ বাবু যেন কতকটা রাগান্বিত হইয়া বলিলেন "আমি আপনার সহিত অভদ্রতা করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার সহিত আপনার আর অধিক আলোচনা চলিতে পারে না।"

আমি উত্তর করিলাম "সে কি কথা! একজন নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন-মরণ আপনার কথার উপরে নির্ভর করিতেছে দেখিয়া আপনি নিস্তব্ধ থাকিবেন ? আপনার শরীরে কি দয়া-মায়া নাই ? আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, আমি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি ? কি আশ্চর্য্য ! আর আপনি কি না একজন উদারপ্রকৃতির লোক হইয়াও এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন ? দেখুন, আমি একা যজ্ঞেশ্বর বাবুর মোকদ্দমা লইয়া এত চেষ্টা করিতেছি না। এখান হইতে বহু দূরে বসিয়া কত উদার প্রকৃতির লোক এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছেন—যজ্ঞেশ্বর বাবুর জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ও বহু অর্থব্যয়ে এ বিষয়ে আমার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। যিনি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে জানেন বা

যাহার সহিত তাঁহার সামান্ত পরিচয়ও ছিল, তিনিই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস না করেন, এই একখানা টেলিগ্রাম দেখিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।"

এই কথা বলিয়া আমি আপনার টেলিগ্রামখানি তাঁহাকে দেখাইলাম। তদ্দৃষ্টে তিনি যেন চমকিত হইয়া বলিলেন, "ডগ্‌লাস্ সাহেব! কেন, ইনি আর যজ্ঞেশ্বর বাবু এক সময়ে——"

"এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া গেলেন—যেন কি একটা ভয়ানক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হইবে, এই ভয়ে তিনি আর কিছু বলিলেন না। আমি তাঁহার কথার ভাবে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সুতরাং তাহার অসম্পূর্ণ কথাগুলি সম্পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য বলিলাম, "—এক সময়ে বিশেষ বন্ধু ছিলেন। পড়ুন, আপনি টেলিগ্রামখানি সমস্ত পড়িয়া দেখুন।"

প্রথমতঃ তিনি যেন তাহা পড়িতে ইচ্ছুক নহেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেন কৌতূহল-পরবশ হইয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ শেষ হইলে, কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া আমার হাতে তাহা ফিরাইয়া দিলেন।

আমি তাঁহার ভাব-গতিক দেখিয়া প্রথমেই কথা কহিলাম, "ডগ্‌লাস সাহেবের নাম দেখিয়া আপনি চমকিত হইলেন কেন? বোধ হয়, আপনি তাঁহাকে বিশেষরূপ জানেন, আর হয় ত শুনিয়াও থাকিবেন যে, এই ডগ্‌লাস সাহেব পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে এখন একজন খুব বড়লোক। এই টেলিগ্রামখানি দেখিলেই বেশ বুঝা যায় যে, ইনি একজন মস্ত ধনী। ইনি কেন আমায় আপনার কাছে সন্ধান লইতে বলিতেছেন, তা' বলিতে পারেন কি? নিশ্চয়ই আপনি আমায় এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন।"

রাধারমণ বাবু বলিলেন, "ডগ্‌লাস সাহেবকে আমি এক সময়ে চিনিতাম বটে। আমার সঙ্গে কখনও তাঁহার বন্ধুতা ছিল না। আপনার সঙ্গে আমি অনেকক্ষণ কথা কহিয়াছি—আর আমার কিছু বলিবার নাই।"

এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম যে, আমি বড় শক্ত লোকের পাল্লায় পড়িয়াছি। এতক্ষণে আমার ধারণা হইল যে, তাহাই এগারজন জুরীতে মিলিয়াও কেন এই একজনকে কোন ক্রমে একমত করাইতে পারেন নাই। উঃ! কি ভয়ানক একগুঁয়ে লোক! যা ধরিয়াছেন, তাহা কোন রকমেই ছাড়িবেন না। যা' একবার স্থির করিয়াছেন, আগাগোড়া সেই চাল বজায় রাখিয়া যাইতেছেন। সেই যে গোড়ায় ধুয়া ধরিয়াছেন, 'আপনাকে বলিবার আমার কিছুই নাই—' শেষ পর্য্যন্ত সেই একই কথা! এ রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক ত আমি জীবনে কখনও দেখি নাই।

অবশেষে কোন উপায় না পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন রকমেই আপনি আমায় সাহায্য করিবেন না? আপনি কিছুতেই কোন কথা প্রকাশ করিবেন না?"

স্থির অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞের ন্যায় তিনি স্পষ্ট কথায় তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "না।"

আমি আরও অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া তাঁহাকে বুঝাইলাম, কত কাকুতি-মিনতি করিলাম, কিছুতেই তাঁহার কঠোর প্রতিজ্ঞা হইতে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিলাম না। কত আশা করিয়া তাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম—সব আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইল। এই পর্য্যন্ত আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি নিশ্চয়ই অনেক কথা জানেন, কিন্তু কিছুতেই কোন কথা প্রকাশ করিবেন না।

পরদিন সকালে আমি জেলে গিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমায় দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলেন এবং বিনা খরচায় স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার পক্ষ-সমর্থনের জন্য আমি যে আদালতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলাম, তজ্জন্য আমায় অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। বড় সাবধান হইয়া তাঁহার সহিত আমায় কথা কহিতে হইল। একেবারেই আমি তাঁহাকে আমার উদ্দেশ্য বলিলাম না। দুই-একটি কথা তাঁহার নিকট হইতে আমার জানিয়া লইবার অভিলাষ ছিল এবং সেইজন্যই আমি অতি সঙ্কুচিত ভাবে ধীরে ধীরে সেই প্রস্তাব করিবার আয়োজন করিতেছিলাম।

আমি প্রথমে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি জানেন কি, কয়জন জুরী আপনার সাপক্ষে আর কয়জন আপনার বিপক্ষে ছিলেন?"

মৃদু হাসি হাসিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "জেলে বসিয়াও আমরা যে বাহিরের কোন কথা জানিতে পারি না, এমন মনে করিবেন না। আমি শুনিয়াছি, এগারজন জুরী আমার বিপক্ষে এবং একজনমাত্র আমার সাপক্ষে ছিলেন।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তাহা হইলে আপনি ঠিক কথা শুনিয়াছেন।"

যজ্ঞেশ্বর বাবু বলিলেন, "এবার আমার মোকদ্দমা উঠিলে বোধ হয়, আর একজনও আমার সাপক্ষে থাকিবেন না। আপনি আমার সঙ্গে এই জেলের ভিতরে দেখা করিতে আসিয়াছেন, সেজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিই। বোধ হয়, আপনি ভাল উদ্দেশ্যেই আসিয়াছেন।"

আমি। হাঁ, আমি আপনার ভালর জন্যই আপনার সঙ্গে আসিয়াছি।

যজ্ঞেশ্বর। আপনাকে কি বিশ্বাস করাইয়া দিতে হইবে যে, আমি এই ভয়ানক খুনী মোকদ্দমায় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ?"

আমি। না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, কিন্তু আপনি যেরূপ ভাবে আপনার নিজের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছেন—তাহা আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ বিপজ্জনক।

যজ্ঞেশ্বর। হইলেও হইতে পারে, তজ্জন্য আমি ভীত বা সঙ্কুচিত নহি। গত কয়বারে আমি যেমন নিজে নিজ পক্ষসমর্থন করিয়াছি, এবারও তাহাই করিব, স্থির করিয়াছি। কোন ব্যারিষ্টারকে আমার পক্ষ-সমর্থনের জন্য নিযুক্ত করিব না। আপনি যে আমায় নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচনা করেন, ইহাতে আমার মনে কতকটা শান্তি হইল।

আমি দেখিলাম,তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "যে জুরী আপনার সাপক্ষে ছিলেন, আপনি তাঁহার নাম জানেন কি?"

যজ্ঞেশ্বর। না, আমি জুরীদের মধ্যে কাহারও নাম জানি না।

আমি। কেন বিচারের দিন সে সকল নাম ত ডাকা হইয়াছিল—আপনি কি তা' শুনেন নাই?

যজ্ঞেশ্বর। না, আমি সেদিকে বড় কাণ দিই নাই। শুনিবার কোন ইচ্ছাও ছিল না—জানিবার কিছু আবশ্যকও বোধ করি নাই।

আমি। জুরীদিগের মধ্যে কি এমন একজনের নামও আপনার কাণে ঠেকে নাই, যিনি আপনার পরিচিত?

যজ্ঞেশ্বর। না, তাঁহারা সকলেই আমার কাছে অপরিচিত।

আমি। যখন জুরীদিগের মুখপাত্র বিচারপতির সম্মুখে আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা কোনক্রমেই একমত হইতে পারিতেছেন না, তখন আপনি অত্যন্ত বিস্মিত ও চমকিত হইয়াছিলেন।

যজ্ঞেশ্বর। আপনি কি সে সময়ে আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন?

আমি। করিয়াছিলাম বৈ কি! আমি কেন, সে সময়ে অনেকেই আপনার প্রতি বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

যজ্ঞেশ্বর। সম্ভব বটে। আমি যদি বন্দী না হইতাম, আর কাঠ-গড়ায় না দাঁড়াইয়া অন্য স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতাম, তাহা হইলে আমিও হয় ত বন্দীর মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। জুরীর মুখপাত্রের কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম বটে। আমি পূর্ব্বাবধিই মনে করিয়াছিলাম যে, জুরীরা সকলেই আমায় দোষী সাব্যস্ত করিবেন।

আমি। আরও, হয় ত আপনার মনে না থাকিতে পারে যে, সেই সময়ে আপনি বিশেষ আগ্রহের সহিত ঝুঁকিয়া জুরীদিগের প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আপনি কাহাকেও চিনিতে পারিয়াছিলেন কি? কাহারও নাম আপনার পরিচিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল কি?

যজ্ঞেশ্বর। না, সত্য কথা বলিতে কি, আমি চোখে ভাল দেখিতে পাই না—তাঁহাদের কাহাকেও চিনিতে পারি নাই।

আমি। কেন আপনার চস্‌মা ত আপনার গলায়ই ঝুলিতেছিল, আপনি তাহা ব্যবহার করেন নাই কেন?

আমার কথা শুনিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবু মৃদু হাস্য করিলেন। এ অবস্থায় তাঁহার মুখে হাসি দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম।

যজ্ঞেশ্বর বাবু বলিলেন, "আপনাদের কুটবুদ্ধির কাছে কোন কথা লুকাইয়া রাখিবার যো নাই। এত তীক্ষ্ণদৃষ্টি বোধ হয়, সাধারণ লোকের হয় না। যাহাই হউক, এ জেলে আসিয়াও যদি আমায় আপনি এ রকম করিয়া জেরা করেন, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আমায় বলিতে হইবে যে, আপনি আর এখানে আসিবেন না।"

তাঁহার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া আমি অতি কষ্টে আত্মসংযম করিলাম। আদালতে তাঁহার আলষ্টার কোটের পকেট হইতে যখন হরতনের নওলাখানি বাহির করা হয়, তখন তিনি এত আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছিলেন কেন, সে কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার আমার ইচ্ছা ছিল। রাধারমণ বাবুর সঙ্গে তাঁহার কোন আলাপ পরিচয় আছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহভঞ্জন করিবারও আমি আশা করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাঁহার এইরূপ মনের ভাব ও কোন কথা বলিতে অনিচ্ছা দেখিয়া আমি মনের কথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তিনিও যেমন বন্ধুতার খাতিরে তাঁহাদের কোন কথা প্রকাশ করিলেন না, আমিও তেমনি তাঁহার সহিত বন্ধুভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম বলিয়া, বিশেষ পীড়াপীড়িও করিতে পারিলাম না। তাঁহার সহিত মনোমালিন্য বা বিবাদ করা ত আমার উদ্দেশ্য ছিল না. সুতরাং আমায় চুপ করিয়া থাকিতে হইল। এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর আমি বলিলাম, "আচ্ছা. আমি খুব সাবধান হইয়াই আপনার সঙ্গে কথা কহিব। আমার এখানে আসা আপনি বন্ধ করিবেন না। এ সকল স্থানে আসা যদিও মানুষের সুখকর নয়, তথাপি আপনার কাছে আসা আমার এখন বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। এ অবস্থায় আমাপেক্ষা বন্ধু আপনার কেহ নাই জানিবেন। আমি আপনার জন্য যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত, তাহা বলিতে পারি না। অর্থের জন্য আমি এতদূর করিতেছি ভাবিবেন না। আমাকে অন্য চক্ষে দেখিবেন।"

যজ্ঞেশ্বর। আপনার কথা শুনিলে আমার মনে বড় আনন্দের উদয় হয়। হয় ত আমি আপনার সহিত অভদ্রোচিত ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছি ; কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমার মনের ভাব তাহা নয়। ঘটনাচক্রে জড়ীভূত হইয়া আমায় এইরূপ করিতে হই-

তেছে। ইচ্ছা করিয়া, দায়ে পড়িয়া আমার এই অবস্থা হইয়াছে। আমার নিজের দোষেই এই অবস্থা ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বোধ হয়, আমি প্রমাণ করিতে পারি যে, এই খুনী মোকদ্দমায় আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ; কিন্তু তাহা হইলে কোন কোন লোকের অসম্মান করা হয়, কোন কোন লোকের মাথা হেঁট করা হয়, কোন ভদ্রকুলমহিলার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হয়। আমার তুচ্ছ জীবন আমি অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু যাহাতে অপরের অনিষ্ট হয়, আমা দ্বারা তাহা কোন মতেই হইবে না। এক সময়ে আমাপেক্ষা সুখী বোধ হয়, জগতে কেহ ছিল কি না সন্দেহ; কিন্তু কোথায় সে সকল সুখের দিন লুক্কায়িত হইল, তাহা কে বলিতে পারে? এক সময়ে আমি বোধ হয়, জগৎপিতা পরমেশ্বরের নিকটে সহস্র বৎসর পরমায়ু যাচ্ঞা করিতে পারিতাম, কিন্তু আজ যদি এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণত্যাগ হয়, তাহা হইলে পর মুহূর্ত্তের প্রত্যাশা করি না।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবু ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিলে পর, তিনি বলিলেন, "হাঁ, জুরিগণের মুখপাত্র যখন বিচারপতির সম্মুখে আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কোন ক্রমেই একমত হইতে পারিতেছেন না, তখন আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম বটে। জুরীদিগের মধ্যে এমন একজন লোক ছিলেন, যিনি আমায় নির্দ্দোষ ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিতে পারেন না। আমার প্রতি তাঁহার এই বিশ্বাসের জন্য, উদ্দেশে অন্তরের সহিত আমি তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলাম।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবু আবার চুপ করিলেন। একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। যেন কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে বা তাঁহার কথা শুনিতেছে কি না, আশে-পাশে কেহ লুক্কায়িত আছে

কিনা, ইহাই জানিবার জন্য তিনি একবার দেখিয়া লইলেন। তার পর অতি মৃদুস্বরে চুপি চুপি আমায় বলিলেন, "এ সময়ে আমার একজন প্রকৃত হিতৈষী বন্ধুর প্রয়োজন।"

আমি তৎক্ষণাৎ ঠিক তাঁহার ন্যায় চুপি চুপি উত্তর করিলাম, "কেন? আমি ত রহিয়াছি। আমি আপনার হিতৈষী বন্ধুর অভাব পূরণ করিতে অভিলাষী। নিঃসন্দেহে আপনি আমার কাছে আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করিতে পারেন।"

আবার চারিদিকে চাহিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবু বলিলেন, "কাজ অতি সামান্য, কিন্তু কোন লোককে আমার বিশ্বাস হয় না। আমার কাছে একখানি পত্র আছে, সেইখানি ডাকে ফেলিয়া দিতে হইবে। এ পত্রে কাহারও কোন সম্পর্ক নাই—কাহারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ইহাতে যে সকল কথা আছে, তাহা সম্পূর্ণ আমার নিজের; জগতের অন্য কোন লোকের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই।"

আমি বলিলাম, "আমি আপনার পত্র ডাকে ফেলিয়া দিব। ইহা ত অতি সামান্য কথা।"

যজ্ঞেশ্বর বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমার মনে কি আছে, তাহাই জানিবার জন্য যেন তিনি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আমি সাহস করিয়া আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারি কি? নহিলে আর বিশ্বাসই বা করিব কাহাকে?"

আমি বলিলাম, "আপনি নিঃসন্দেহে আমায় বিশ্বাস করিতে পারেন। আমি আপনার পত্র ডাকে ফেলিয়া দিতে কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করিব না।"

যজ্ঞেশ্বর বাবু বলিলেন, "কাছে নয়—এ সহরের ভিতরে নয়—

অন্ততঃ এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে—কোন গ্রাম্য পোষ্ট আফিসে ইহা ফেলিয়া দিতে হইবে।"

আমি। আচ্ছা, তাহাই হইবে। আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি সেই মতই কাজ করিব।

যজ্ঞেশ্বর। আমি কি আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি? আপনি আমার বিশ্বাসের মান রাখিতে পারিবেন কি? বলুন, আপনার দ্বারা বিন্দুমাত্র বিশ্বাসঘাতকতা হইবে না।

আমি। আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন। কোন সন্দেহই করিবেন না—আমার দ্বারা আপনার বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র হানি হইবে না। জগতে মানুষ মানুষকে যতদূর বিশ্বাস করা সম্ভব হয়, আপনি আমায় তদপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিতে পারেন।

যজ্ঞেশ্বর বাবু ছল্ ছল্ নেত্রে বিনা বাক্যব্যয়ে তখন তাঁহার সেই অতুলনীয় বিশ্বাসের দ্রব্য সেই পত্রখানি আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি তাহা গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি আবার আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে পারি?"

উদাসীন ভাবে তিনি উত্তর করিলেন, "আসিবেন। আপনার সঙ্গে কথা কহিয়া আমার আজিকার দিনের ক্লেশের অনেকটা লাঘব হইল।"

অনন্তর আমি তাঁহার নিকটে বিদায় লইয়া সেখান হইতে বহির্গত হইলাম। তথা হইতে একেবারে হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া বর্দ্ধমানের একখানি টিকিট ক্রয় করিলাম। যথা সময়ে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া ডাকে পত্রখানি ফেলিয়া দিতে যাইতেছি, এমন সময়ে খামের উপরে লিখিত নাম ও ঠিকানার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল;—

"মিস্ মনোরমা বসু
নং—পার্ক ষ্ট্রীট কলিকাতা।"

একি! এই ঠিকানায়ই ত আমি রাধারমণ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। সর্ব্বনাশ! এ রাধারমণ বাবু তবে কে? এ মনোরমা তবে কে? আবার ভাবিলাম, যজ্ঞেশ্বর বাবুর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হইল কি? কেন আমি তাঁহার পত্র দেখিলাম?

পত্রখানি ত ডাকে দেওয়া হইল। কিন্তু এ মনোরমা কে, এই ভাবনাতেই আমি পাগল হইলাম। তৎক্ষণাৎ ডগ্‌লাস সাহেবকে একখানি টেলিগ্রাম করিলাম;—

"মিস্ মনোরমা বসু কে, এবং তাঁহার সহিত রাধারমণ বাবুর কোন সম্পর্ক আছে কি না, ইহা আমি জানিতে চাহি। মনোরমার সহিত যজ্ঞেশ্বর বাবুর কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে কি না, এ কথা জানাও আমার বিশেষ আবশ্যক। হরতনের নওলা সম্বন্ধীয় কোন ঘটনা আপনি জানেন কি না?"

যথাসময়ে টেলিগ্রামের উত্তর পাইলাম। তাহাতে ডগ্‌লাস সাহেব বলিতেছেন;—

"মিস্ মনোরমা বসু রাধারমণ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী। যজ্ঞেশ্বর বাবুর সহিত এক সময়ে মনোরমার প্রণয় হয় এবং বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া যায়। সহসা তাঁহারা নিজেই সে কথাবার্ত্তা ভঙ্গ করেন। কেন এরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সকলেই জানিতেন, তাঁহারা উভয়ে উভয়কে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। হরতনের নওলার কথা আপনি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতেই পারিলাম না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন ডগ্‌লাস সাহেবকে আমি নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলাম ;—

"মহাশয় !

আপনি তারে আমাকে যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহাতে আমার বিশেষ উপকার হইতে পারে। মিস্ মনোরমা বসু ও যজ্ঞেশ্বর মিত্র উভয়ে এক সময়ে বড় প্রণয় ছিল এবং তাঁহাদের বিবাহের কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল, এ কথা জানা আমার বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আপনার পত্রে বোধ হয়, আপনি মনোরমা সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিবেন ; কিন্তু ততক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারি না। আমার পক্ষে এখন এক মুহূর্ত্ত অপব্যয় করা উচিত নহে। আমার সময় এখন বহু-মূল্য। আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, আপনার পত্র-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই আমি হরিদাস গোয়েন্দার সাহায্যে এমন কোন গুপ্ত রহস্য বাহির করিয়া ফেলিব যে, তাহাতে এই মোকদ্দমায় বিশেষ সাহায্য হইবে। এখন শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, যজ্ঞেশ্বর বাবুর মোকদ্দমাই যেন আমার জপমালা হইয়াছে।

হরতনের নওলা সম্বন্ধে যে, আমি আপনার নিকট জানিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা আপনি বাজে কথা বলিয়া মনে করিবেন না। এই হরতনের নওলাখানি যজ্ঞেশ্বর বাবুর আল্‌ষ্টার কোটের পকেটে পাওয়া গিয়াছিল। এখানি কেমন করিয়া তাঁহার পকেটে আসিল, তাহা তিনি নিজেই জানিতেন কি না সন্দেহ। আমার বিশ্বাস, এই হরতনের

নওলা হইতেই সমস্ত ঘটনা বাহির হইয়া পড়িবে। আমি যেন দিব্য-চক্ষে দেখিতে পাইতেছি যে, এই হরতনের নওলার সঙ্গে এই খুনের মোকদ্দমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

হরিদাস গোয়েন্দা আমাকে এক গুপ্ত সংবাদ দিয়াছেন যে, মিস্ মনোরমা বসু রাধারমণ বাবুর বাড়ীতে থাকেন না। তবে কখন কখন আসেন বটে। রাধারমণ বাবুর এক কন্যা আছেন; তাঁহার সঙ্গে মনো-রমার বড় ভাব। মনোরমার গুপ্ত পত্র সকল রাধারমণ বাবুর কন্যার কাছেই আসে; তিনি আবার তাহা গুপ্তভাবে মনোরমার নিকটে পাঠাইয়া দেন। মনোরমার পিতা বড় লোক, কিন্তু তিনি হয় ত কিছু কড়া। তাহাই বোধ হয়, পার্ক ষ্ট্রীটের ঠিকানায় মনোরমার পত্রাদি প্রেরিত হয়।

হরিদাস গোয়েন্দার সাহায্যে মনোরমার বাড়ীর ঠিকানা জানিতেও আমার বিশেষ কোন ক্লেশ পাইতে হয় নাই। মনোরমার পিতার বাড়ী গোলদীঘীর দক্ষিণদিকে মিরজাফর ষ্ট্রীটের উপরে। বাড়ীখানি প্রকাণ্ড, রাজ-রাজড়ার বাড়ীর ন্যায়। দেখিয়া অনুমান করা যায়, এ বাড়ীতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের আয় মাসিক দশ হাজার টাকার কম নহে।

মনোরমার সহিত কেমন করিয়া সাক্ষাৎ করিব, এই চিন্তা করি-তেছি, এমন সময়ে একটি আশ্চর্য্য সুযোগ মিলিল। ডাক্তার অম্বিকা চরণ বাবু আমার একজন বিশেষ বন্ধু। তিনি আমায় সংবাদ দিলেন, মনোরমার উৎকট পীড়া হইয়াছে। চিকিৎসার জন্য ঘটনাচক্রে মনো-রমার পিতা অম্বিকাচরণ বাবুকেই ডাকাইয়াছিলেন। অম্বিকাচরণ বাবু এ খুনের মোকদ্দমার দৈনিক সংবাদ আমার নিকটে প্রাপ্ত হয়েন; সুতরাং যাহা যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, সকল কথাই তিনি জানেন। মনো-রমার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করেন।

অম্বিকা বাবু বলেন যে, মনোরমার পিতামাতা, কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। অনেক বড় বড় ডাক্তারকে দেখাইয়াও তিনি কোন ফল প্রাপ্ত হয়েন নাই। প্রকৃতপক্ষে মনোরমার ব্যাধি কি, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহই নিরাকরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু অম্বিকাচরণ বাবু মনোরমার পিতামাতাকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এ রোগ শারীরিক নয়—মানসিক। ছাব্বিশে আষাঢ় তারিখ হইতে মনোরমার এই ব্যাধি হইয়াছে।

মনোরমার পিতা বড় কড়া লোক—একগুঁয়ে, যা ধরেন, সহজে তা ছাড়েন না। কিন্তু মনোরমার মাতা বড় মিষ্টভাষিণী, দয়াবতী ও একমাত্র কন্যার সাংঘাতিক পীড়ায় সন্তপ্ত। মনোরমার পিতা অম্বিকাচরণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন প্রকার ঔষধ সেবনে মনোরমার কিছু উপকার দর্শিতে পারে কি না? অম্বিকাচরণ বাবু তাহাতে এই উত্তর দিয়াছিলেন যে, মানসিক ব্যাধির কোন ঔষধ নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেই মানসিক ক্লেশের কারণটি অপসারিত করা যাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনোরমার ব্যাধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ডাক্তার অম্বিকাচরণ বাবু ও মনোরমার পিতামাতা যেরূপভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অল্পাংশ উদ্ধৃত হইল ;—

মনোরমার পিতা ডাক্তার অম্বিকাচরণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি কোন প্রকার ঔষধ দিতে পারেন না?"

অম্বিকাচরণ বাবু উত্তর করেন, "অবশ্য আমি একটা ঔষধ দিতে পারি, কিন্তু তাহাতে রোগীর কোন উপকার হইবে, এমন বোধ হয় না। যে সকল ঔষধ এই ঘরে রহিয়াছে, সাধারণতঃ চিকিৎসকমাত্রেই এ প্রকার রোগে এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখন আপনারা বিবেচনা করুন।"

মনোরমার পিতা জিজ্ঞাসা করেন, "যদি এই ভাবে আর কিছুদিন থাকে, তাহা হইলে এ রোগীর কি হওয়া সম্ভব?"

অম্বিকা। মনোরমার শারীরিক বল ও জীবনী শক্তি দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। এইরূপভাবে আর কিছুদিন থাকিলে রক্ষা পাওয়া শক্ত হইবে।

এই কথায় মনোরমার মাতা অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করেন। মনোরমার পিতা বলেন, "অম্বিকাচরণ বাবু! আমরা শুনিয়াছি, আপনি অনেক উৎকট ও বিষম রোগ আরোগ্য করিয়া বিশেষ খ্যাতি-লাভ করিয়াছেন। আপনার সুচিকিৎসার জন্য অনেক বড় বড় ডাক্তারও অনেক সময়ে বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। আপনার যশঃ ও সুখ্যাতি শুনিয়াই আমরা আপনাকে আনিয়াছি।"

অম্বিকা। আমি অনেক দুশ্চিকিৎস্য রোগ আরোগ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা আমি যত লোকের করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই গুপ্তকথা আমাকে বলিতে হইয়াছে। কারণ রোগীর প্রতি ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে তাহার কি রোগ, তাহা জানা একান্ত আবশ্যক। এই সূত্র না পাইলে কখনই রোগের প্রকৃত চিকিৎসা করা হয় না। আমি যে সকল রোগ আরোগ্য করিয়াছি, তাহাদিগের প্রত্যেকেরই আন্তরিক অবস্থা ও গুহ্যকারণ সমস্তই আমি জানিতাম।

মনোরমার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মনে করেন, কোন গুপ্ত বিষয় আপনার কাছে লুকাইয়া রাখা হইতেছে?"

অম্বিকা। সে কথা আপনারা বলিতে পারেন, আমি তার কিছুই জানি না। আমি কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আপনার কন্যার রোগ মানসিক এবং ইহা সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত

আমি রোগের কারণ জানিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন চিকিৎসাই চলিতে পারে না।

মনোরমার পিতা বলিলেন, "আপনি কাল একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক আসিবেন।"

অম্বিকা। আমি সন্ধ্যার সময়েই আর একবার আসিতে পারি। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আপনার কন্যা মনোরমাকে সে সময়ে একবার দেখিয়াও যাইতে পারি।

মনোরমার পিতা অম্বিকাচরণ বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিলেন।

এই পর্য্যন্ত কথা শুনিয়া আমি অম্বিকাচরণ বাবুকে বলিলাম, "ডাক্তার! আমি তোমায় দুই-একটা কথা বলিতে পারি। এই মনোরমার সহিত এক সময়ে যজ্ঞেশ্বর বাবুর প্রণয় ছিল এবং উভয়ের বিবাহের কথাও ঠিক হইয়া গিয়াছিল। আমার বোধ হয়, ইহাদিগের খুব ভালবাসাও জন্মিয়াছিল।"

অম্বিকাচরণ বাবু বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, "বল কি! তুমি যে আমায় আশ্চর্য্য করিলে!"

তাহার পর অম্বিকাচরণ বাবুর সহিত এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলেন যে, সম্ভবতঃ তিনি এ গুপ্ত রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিবেন। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, হয় ত এই সূত্র ধরিয়াই আমরা জটিল এ খুনী মোকদ্দমার যা হয়,একটা শেষ নিষ্পত্তি করিতে পারিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ডগ্‌লাস সাহেবকে টেলিগ্রাম করিলাম ;—

"আপনি মনোরমা সম্বন্ধে কি জানেন, সত্বর লিখিবেন। তাহার বাপ মা, ভাই বোন যদি কেহ থাকেন, সকলের সম্বন্ধেই কিছু কিছু জানা আমার একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

যথাসময়ে উক্ত টেলিগ্রামের উত্তর পাইলাম ;—

"মনোরমার ভগ্নী নাই। কিন্তু তাহার একটি ভাই আছে, তাহার নাম নবীনচন্দ্র। নবীন ও মনোরমা উভয়ে যমজ। নবীনকে মনোরমা অত্যন্ত ভালবাসে। মনোরমার পিতা একজন ভয়ানক একগুঁয়ে ও একরোখা লোক। তিনি বড় কাহারও কথা শুনিয়া কাজ করেন না। আমি নিজে এক সময়ে মনোরমাকে বিবাহ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলাম। তাহাতে মনোরমার পিতার খুব সহানুভূতি ছিল। এমন কি তিনি জোর করিয়া মনোরমার সহিত আমার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন ; কিন্তু আমি যখন দেখিলাম, মনোরমা যজ্ঞেশ্বর বাবুকে প্রাণের সহিত ভালবাসে এবং তাঁহার সহিত বিবাহেই মনোরমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, তখন আমি স্ব-ইচ্ছায় সে আশা পরিত্যাগ করিলাম। আমি এইরূপ করিয়াছিলাম বলিয়াই মনোরমা আমাকে ভাল চক্ষে দেখে এবং আমাকে শ্রদ্ধা করে। কেবল মনোরমার জন্যই আমি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে চাহি। আমার বিশ্বাস, মনোরমা যজ্ঞেশ্বর বাবুকে এখনও প্রাণের সহিত ভালবাসে এবং তাঁহার এই বিপদের কথা

শুনিয়া না জানি অভাগিনী কত ক্লেশই পাইতেছে। যদি যজ্ঞেশ্বর বাবুর কোন বিপদ্ ঘটে, তাহা হইলে মনোরমা বাঁচিবে কি না সন্দেহ। নবীনের কথা আমি বড় কিছু জানি না। আমি তাহাকে জীবনে একবারমাত্র দেখিয়াছি। মনোরমার মাতা মিষ্টভাষিণী ও দানশীলা। আমার ধারণা এই যে, তিনি তাঁহার স্বামীর ভয়ে কোন কথা প্রকাশ করিতে পারেন না।"

এই টেলিগ্রামখানি পাইয়া আমি ডগ্‌লাস সাহেবকে আবার একখানি পত্র লিখিলাম ;—

"আপনার টেলিগ্রামখানি পাইয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। আপনি যে কি জন্য এত অর্থ ব্যয় করিয়াও যজ্ঞেশ্বর বাবুকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমি এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। আপনার ন্যায় উদার প্রকৃতির লোক আমি পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। যাঁহার সাহায্য করিতে আপনি অগ্রসর হইয়াছেন, অন্য লোক হইলে যাহাতে তাঁহার সর্ব্বনাশ হয়, সেই চেষ্টাই আগে করিত। এরূপ অবস্থায় প্রণয়ের বিরোধীজনের প্রতিহিংসা দ্বেষ থাকাই সম্পূর্ণ সম্ভব। যজ্ঞেশ্বর বাবুর প্রতি আপনার ঈর্ষাপরবশ হওয়া কিছু বিচিত্র বলিয়া বোধ হইত না ; কিন্তু আপনি প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে জীবন দান করিবার জন্য যে উদারতা দেখাইয়াছেন, এ কালের লোকের এরূপ প্রবৃত্তি প্রায় দেখা যায় না। এখন হইতে আমি আপনাকে আরও ভক্তির চক্ষে দেখিব। এরূপ দেবপ্রকৃতির লোকের সহিত কাজ করিয়াও সুখ আছে।

আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, যদি অম্বিকাচরণ বাবু মাঝে না থাকিতেন, তাহা হইলে হরিদাস গোয়েন্দাকে আরও অধিক পরিশ্রম করিতে হইত, এই সামান্য বিষয় জানিবার জন্য হয় ত কত নূতন

কৌশলজালের সৃষ্টি করিতে হইত। আপনার পত্রে হরিদাস গোয়েন্দার আশ্চর্য্য কূটবুদ্ধির জোরে ও অম্বিকাচরণ বাবুর সহায়তায় অতি শীঘ্র আমি এই হরতনের নওলার গুপ্ত রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে সক্ষম হইব। আর আমার বোধ হয়, এই গুপ্ত রহস্যের কারণ নিরাকরণ করিতে পারিলেই নিশ্চয় এ মোকদ্দমায় আমাদের জয় হইবে। অম্বিকাচরণ বাবুকে হরিদাস গোয়েন্দা যেরূপ শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, তিনি সেই মতই কার্য্য করিতেছেন। হরিদাস গোয়েন্দার কূটকৌশলজালপূর্ণ মন্ত্রণা সকল শুনিয়া তাঁহার ক্ষমতার উপর আমার অত্যন্ত আস্থা জন্মিয়াছে এবং আমার স্থির বিশ্বাস, তাহার সাহায্য বিনা আমরা কখনও এ কার্য্যে সফলকাম হইতে পারিতাম না।

ডাক্তার অম্বিকাচরণ বাবু এখন দুই বেলা মনোরমাকে দেখিতে যাইতেছেন। মনোরমা এখনও অত্যন্ত পীড়িত। তাহার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। একদিন অম্বিকা বাবু নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, রোগিনীর জীবন সঙ্কটাপন্ন। মস্তিষ্কেরও দোষ জন্মিয়াছে। মনোরমা সর্ব্বদা শূন্যদৃষ্টি একদিকে চাহিয়া থাকে। বিকারের অবস্থায় সে আবোল-তাবোল অনেক বাজে কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি মনোরমাকে মাতাকে কন্যার ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধির কথা বলিলেন। শুনিয়া জননীর মুখ শুকাইল, অম্বিকাচরণ বাবু ডাক্তার—কূটবুদ্ধির বিশেষ কোন ধার ধারেন না। যদি আমি কোন ক্রমে সেখানে উপস্থিত থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয় ত মনোরমার অজ্ঞান অবস্থার কথা শুনিয়া এ রহস্যের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতাম।

মনোরমার পিতা ডাক্তার অম্বিকাচরণ বাবুর সহিত একদিন গুপ্ত পরামর্শ করিয়াছিলেন। অম্বিকা বাবু কিন্তু তাঁহাকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এ ব্যাধি শারীরিক নয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার প্রকৃত কারণ



"রোগিনার জীবন সঙ্কটাপন্ন।"

[হরতনের নওলা—৯৮ পৃষ্ঠা।

Lakshmibilas Press.

তিনি জানিতে না পারিতেছেন, ততক্ষণ চিকিৎসায় কোন ফলোদয় হইবে না। আর এরূপভাবে মনোরমাকে অধিক দিন ফেলিয়া রাখিলে মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী।

এই গুপ্ত পরামর্শে প্রথমে মনোরমার মাতা উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু তাহার পর তিনি আসিয়াছিলেন। অম্বিকাচরণ বাবু এই সময়ে বেশ ভাল করিয়া মনোরমার মাতাপিতা উভয়কেই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের কন্যার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। মনোরমার মাতা অম্বিকাচরণ বাবুর কথায় অজস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; কিন্তু মনোরমার পিতার হৃদয় এমনই কঠিন যে, তিনি এ সকল কথা শুনিয়াও সম্পূর্ণ অবিচলিত রহিলেন।

অম্বিকাচরণ বাবু আমাকে এই সকল কথা বলিতে বলিতে কহিলেন, "কিন্তু পিতার হৃদয় কঠিন হইলেও আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, অন্তরে অন্তরে তিনি অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতেছিলেন। মনোরমাকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসেন।"

অম্বিকাচরণ বাবু যতই মনোরমার পিতামাতাকে তাঁহাদিগের কন্যার এইরূপ মানসিক বিকারের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, মনোরমার পিতা ততই তাহা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। মনোরমার মাতা ছলছলনেত্রে প্রতিদিন অম্বিকাচরণ বাবুকে বিদায় দিবার সময়ে পরদিন পুনরায় আসিবার জন্য বলিয়া দেন।

অম্বিকাচরণ বাবু দুই-চারিদিন এইরূপভাবে দুই বেলা আসা-যাওয়া করিয়াও যখন কোন গুপ্ত কারণের অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না, তখন কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া একদিন তিনি মনোরমার পিতাকে বলিলেন, "আমি প্রতিদিন এরূপভাবে আসা-যাওয়া করিলে ত আপনার কোন ফল হইবে না। আপনার কন্যার জীবন-সঙ্কটাবস্থায়ও যখন

আপনি সে সকল গুপ্ত কারণ অপ্রকাশ রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন আমি কাজেকাজেই বাধ্য হইয়া বলিতেছি যে, আপনি আপনার কন্যার জীবন লইয়া বালকের ন্যায় খেলা করিতেছেন।"

অম্বিকাচরণ বাবু একজন যে-সে ডাক্তার নহেন। তাঁহার খুব পশার—বেশ হাত-যশঃ। সুতরাং ডাক্তারী হিসাবে তিনি যে কথা বলিবেন, তাহা অবশ্য মূল্যবান্। তাঁহার মুখে এইরূপ কড়া কথা শুনিয়া মনোরমার পিতা বড় ভীত হইলেন।

অম্বিকাচরণ বাবু তাঁহাকে আরও বলিলেন, "যদি আপনি বরাবর এইভাবে চলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনি অন্য ডাক্তার আনিতে পারেন, কিন্তু আমার ডাক্তারী জ্ঞান যতদূর, তাহার উপরে নির্ভর করিয়া আমি আপনাকে স্পষ্ট বলিতে পারি যে, এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে দুই-একদিনের মধ্যেই আপনার কন্যার প্রাণবিয়োগ হইবে। আমার উপরে বিশ্বাস না হয়,আপনি আমাপেক্ষা ভাল ডাক্তার আনাইয়া আমার বর্ত্তমানে বা অবর্ত্তমানে পরামর্শ করিয়া দেখিবেন। আর আমি যে যে কথা বলিয়াছি, সে সকল কথা তাঁহাকে বলিবেন।"

মনোরমার পিতা তাহাতে উত্তর করেন, "আপনার চিকিৎসার ক্ষমতার উপরে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে।"

অম্বিকা। কই, আপনি ত সে বিশ্বাসমত কাজ করিতেছেন না।

তাহার পর মনোরমার পিতা তাঁহাকে আর একবার আসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। অম্বিকাচরণ বাবু যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাদের কথায় সম্মত হইয়া বলেন, "কিন্তু এবার আসিলেও যদি আপনি মনোরমার মানসিক কষ্টের গুপ্ত কারণ আমাকে না বলেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন যে, সেই আসাই আমার শেষ আসা হইবে। চিকিৎসা-

শাস্ত্রে আমার যেটুকু সুখ্যাতি আছে, তাহা আমি এরূপভাবে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না।”

অম্বিকাচরণ বাবু যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেই কথামতই আর একবার মনোরমাকে দেখিতে গেলেন। মনোরমার মাতার সহিতই প্রথমে অম্বিকাচরণ বাবুর সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, “ডাক্তার বাবু! আপনি বোধ হয়, শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, আমার স্বামী আপনার নিকটে সেই গুপ্ত কারণ প্রকাশ করিতে সম্মত হইয়াছেন, এবং আমাকে সে কার্য্যের ভার দিয়াছেন। এখন আপনি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।”

অম্বিকাচরণ বলিলেন, “তাহা হইলে আপনি তাঁহাকে রাজী করিতে সমর্থ হইয়াছেন।”

মনোরমার মাতা বলিলেন,“আজ্ঞে হাঁ, অনেক কষ্টে আমি তাঁহাকে সম্মত করিতে পারিয়াছি। এখন বোধ হয়, আপনি আমার কন্যার জীবন দান করিতে পারিবেন।”

অম্বিকাচরণ বলিলেন, “সে ভগবানের হাত, ঔষধে ও চিকিৎসায় যদি কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আমার দ্বারা সে চেষ্টার কোন ক্রটি হইবে না, জানিবেন।”

মনোরমার মাতা বলিলেন, “আপনি আমার কাছে এখন কি জানিতে চাহেন?”

অম্বিকাচরণ বলিলেন,“আপনার কন্যার সম্বন্ধে সমস্ত কথাই আমায় বলুন। কি মানসিক চিন্তায় আপনার কন্যা এত উৎপীড়িত, আপনি নিশ্চয় তাহা জানেন। সে কথা আমার জানা আবশ্যক। কোন কথা অপ্রকাশ রাখিবার চেষ্টা করিবেন না। আপনার কন্যা—তাহার জন্য

আপনার প্রাণ যত কাঁদিবে, অপরের তাদৃশ না হইতে পারে। ডাক্তারের কাছে কোন কথা লুকাইলে চলিবে না।"

মনোরমার মাতা বলিলেন, "ডাক্তার বাবু! আমার প্রাণের ভিতরে যে কি হইতেছে, তাহা আপনাকে বলিতে পারি না। মনোরমা যদি আমায় ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমি কখনই বাঁচিব না।"

এই বলিয়া মনোরমার মাতা মনোরমার কথা বিবৃত করিতে লাগিলেন ;—

"মনোরমা ও নবীন আমার যমজ সন্তান। ভ্রাতা ও ভগ্নীর অন্তরে পরস্পরের প্রতি প্রবল স্নেহস্রোত ছিল। মনোরমা নবীনকে এক দণ্ড দেখিতে না পাইলে যেমন কাতর হইত—নবীনও মনোরমা তিলার্দ্ধ চক্ষের অন্তরাল হইলে সেইরূপ ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইত। কিন্তু হাজার হউক, নবীন বেটা ছেলে, তাহার ভালবাসা মনোরমা অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প। তা বলে যে নবীন মনোরমাকে ভালবাসিত না বা স্নেহ করিত না, এরূপ নহে। ভাই ভগ্নীতে দিন রাত একত্র থাকিত, একত্র খেলা করিত, একত্র আহার করিত। এইরূপ আঠার বৎসর তারা এক সঙ্গে বাস করিয়াছিল।

"এই সময়ে নবীনকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি করা হয়। ইতি-পূর্ব্বে নবীন হেয়ার স্কুলে পড়িত। আমার স্বামী নবীনের লেখা পড়ার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি তাঁহার সন্তান দুটিকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, কিন্তু অপত্য-স্নেহ অপেক্ষা তাঁহার নিজের আত্মসম্ভ্রম বোধ অধিক ছিল।

"ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হইয়া নবীন কলেজেই থাকিত। সে প্রতি সপ্তাহে মনোরমাকে চারি-পাঁচখানি করিয়া চিঠী লিখিত ; কিন্তু আমি বা আমার স্বামী এই সকল পত্রের মর্ম্ম কিছুই সংগ্রহ করিতে

পারিতাম না। চিঠী লিখিবার এক রকম নূতন পদ্ধতি তাহারা আবিষ্কার করিয়াছিল। ছেলেবেলা হইতেই তাহারা এই রকমে চিঠী-পত্র লেখালিখি করিত। এই সকল চিঠী কেমন এক নূতন অসংবদ্ধ ধরণে লিখিত হইত যে, পত্রে কি লেখা থাকিত, তাহা তাহারা দুইজন ভিন্ন অন্য লোকে কিছুই বুঝিতে পারিত না। এক-একদিন মনোরমা নবীনের চিঠী আনিয়া হাসিতে হাসিতে আমায় বলিত, 'মা এই চিঠীখানা পড় দেখি?' কিন্তু আমার কি সাধ্য যে, আমি সে চিঠী পাঠ করি। আমার পক্ষে তাহা যেন গ্রীক্ বা লাটীন ভাষার লেখার মত বোধ হইত। চিঠীতে কতকগুলি কথা ও কয়েকটি নম্বর একত্র তাল পাকাইয়া থাকিত। একটা কথার ধারে একটা নম্বর, আবার একটা নম্বরের গায়ে তিন-চারিটা কথা—এইরূপে চিঠীখানি পূর্ণ থাকিত; দেখিলেই আমার উহা গোলক-ধাঁধার মত বোধ হইত—আমি উহার কিছুই বুঝিতে পারিতাম না; কিন্তু মনোরমা সেই সকল পত্র আমার সম্মুখে বসিয়া অনায়াসে পড়িয়া যাইত; কোথাও থামিত না বা কোন রূপ আট্‌কাইত না।

"আমার মনে আছে, মনোরমা একদিন বলিয়াছিল, 'দেখ মা! আমাদের যদি কোন গুপ্তকথা থাকে, তাহা আমরা অনায়াসে এইরূপ চিঠীপত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরের নিকটে প্রকাশ করিতে পারি। আমরা কি লিখিয়াছি, কেহই পড়িতে পারিবে না। কারণ আমাদের এইরূপ চিঠী লিখিবার কৌশল কেহই জানে না।' ডাক্তার বাবু! বলিতে কি তখন তাহার কথায় আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হয় নাই যে, উহার ভিতরে কত গুরুতর বিষয় লুক্কায়িত থাকিতে পারে।

"কলেজেই নবীনের সর্ব্বনাশ হয়। অসৎসঙ্গে পড়িয়া সে নিতান্ত দুশ্চরিত্র হইয়া পড়ে। তাহার আহার-ব্যবহার, রীতি-নীতি একবারেই

বদ্‌লাইয়া যায়। লেখা পড়ার সময় সে জুয়াখেলায় ও অসৎ কার্য্যে কাটাইত। কাজেই কলেজে তাহার কোন সুনাম বা সুখ্যাতি ছিল না। সেখানে সকলেই তাহাকে বখা-ছেলে মনে করিত। লেখাপড়ার ত কথাই নাই। সে দিনান্তে একবারও বই লইয়া বসিত কিনা সন্দেহ। আমার স্বামী আশা করিয়াছিলেন যে, নবীন সুখ্যাতির সহিত পাশ হইয়া কলেজ হইতে বাহির হইবে, কিন্তু হায়! দুরদৃষ্টবশতঃ তাঁহার সকল আশায় ছাই পড়িল। কাজেকাজেই যখন তিনি কলেজে পুত্রের কুব্যবহার সকল জানিতে পারিলেন, তখন একবারে ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইল না দেখিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত ও নিরাশ হইলেন।

"যখন পুত্রের অসদাচরণের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হয়, তখন নবীন উৎসন্নের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল, এবং অনেক দুষ্কর্ম্ম ইতি-পূর্ব্বেই সাধন করিয়াছিল। তাহার পর হঠাৎ একদিন নবীন কলেজ হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, আর কোনক্রমেই কলেজে যাইতে স্বীকৃত হইল না। প্রাণান্তেও সেখানে আর যাইবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিল।

"ঠিক এই সময়েই মনোরমার জীবনস্রোতের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। মনোরমা সুন্দরী, প্রতিভাশালিনী ও সদাচারসম্পন্না। তাহার স্বভাব-চরিত্র অতীব বিনীত ও মধুর। এক কথায় তখন সে কোমলতা লাবণ্য ও বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তিরূপিণী। এ সকল গুণসত্ত্বেও সে আবার সমাজে বিশেষ পরিচিত ও মান্যগণ্য ধনবানের কন্যা। সুতরাং অনেক সম্ভ্রান্ত যুবক মনোরমার পরিণয়ার্থী হইয়া তাহার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিতে লাগিল। দুইজন ব্যতীত অপর সকলকেই আমরা এক রূপ বিদায় করিয়াছিলাম। যে দুইজন মনোরমার করপ্রার্থী হইয়া-

ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম যজ্ঞেশ্বর মিত্র ও আর এক-জনের নাম ডগ্‌লাস সাহেব।

"আমার স্বামীর ইচ্ছা, ডগ্‌লাস সাহেবের সঙ্গে মনোরমার বিবাহ হয়; কিন্তু মনোরমার কাকা রাধারমণ বাবুর একান্ত ঝোঁক, যজ্ঞেশ্বর বাবুর সহিত মনোরমার বিবাহ দেওয়া হয়। এমন কি নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য মনোরমার কাকা রাধারমণ বাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে ডগ্‌লাস সাহেবের নিন্দা ও যজ্ঞেশ্বর বাবুর প্রশংসা সদা-সর্ব্বদাই করিতেন। আমার স্বামী ডগ্‌লাস সাহেবকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সুতরাং কেহ তাঁহার নিন্দা করিলে তিনি বড় বিরক্ত হইতেন। মনোরমা কিন্তু নিজের বিষয় নিজে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়া-ছিল। সে যজ্ঞেশ্বর বাবুকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, তাঁহার প্রতিই প্রাণ, মন সমর্পণ করিয়াছিল।

"এই সময়ে যজ্ঞেশ্বর বাবু ও ডগ্‌লাস সাহেব উভয়েই আমাদের বাড়ীতে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। উভয়েই মনে করিতেন, মনোরমার প্রেমপাত্র হইবেন। মনোরমাকে বিবাহ করিবার আশা উভয়েই সম-ভাবে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন; কিন্তু এরূপে আর কত দিন চলিতে পারে? যজ্ঞেশ্বর বাবুর প্রতি মনোরমার অধিকতর ভালবাসা—ক্রমে সকলেই বুঝিতে পারিলেন। তখন ডগ্‌লাস সাহেব অত্যন্ত ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়িলেন। বহুকষ্টে তিনি মনের অনল মনে নির্ব্বাপিত করিয়া মনোরমার পাণিগ্রহণের আশায় জলাঞ্জলি দিলেন।

"ডগ্‌লাস সাহেবের পক্ষে আরও আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমার স্বামী তাঁহার পক্ষ-সমর্থন করিলেও তিনি সফলকাম হইতে পারিলেন না। পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ডগ্‌লাস সাহেব মনোরমাকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে

তিনি মনোরমার সহিত একদিন নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া আপনার প্রাণের উচ্ছ্বাস পরিব্যক্ত করেন।

"ডগ্‌লাস সাহেব যজ্ঞেশ্বর বাবুর সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মনোরমাকে বিবাহ করিতে আসিয়াই যে ইঁহাদের পরস্পরের আলাপ হইয়াছিল, তাহা নহে। অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ডগ্‌লাস সাহেব মনোরমাকে পাইলেন না বলিয়া যে, যজ্ঞেশ্বর বাবুর সহিত শত্রুতা করিবেন,তিনি সে স্বভাবের লোক নহেন। তাঁহাদের প্রণয় পূর্ব্বের ন্যায়ই অবিচলিত রহিল। এমন কি ডগ্‌লাস সাহেব, যাহাতে মনোরমা ও যজ্ঞেশ্বর বাবুর পরিণয়ের পর, উভয়ে সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন প্রতিশ্রুত হন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, কোন সময়ে মনোরমা বা যজ্ঞেশ্বর বাবুর কোন উপকার করিতে পারিলে, তিনি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন। ডগ্‌লাস সাহেবের মহত্ত্ব ও উদারতা এই ঘটনা হইতেই বেশ বুঝা যায়।

"মনোরমার প্রণয়লাভে অসমর্থ হইয়া ডগ্‌লাস সাহেব নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। এমন কি তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। এই সময়ে তিনি আর আমাদের বাড়ীতে বড়-একটা যাতায়াত করিতেন না। একদিন আমার স্বামী তাঁহার লিখিত এক-খানি পত্র পাইলেন। এই পত্রে, ডগ্‌লাস সাহেব কলিকাতা ছাড়িয়া আগ্রায় বাস করিবার অভিমত আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন, এবং অতি বিনীতভাবে আমাদের কাছে বিদায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আগ্রায় ডগ্‌লাস সাহেবের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হন। তিনি তথায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই আপনার প্রতিভা ও উদ্যমের সাহায্যে যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় করেন।

"ডগ্‌লাস সাহেব চলিয়া গেলে, মনোরমা ও যজ্ঞেশ্বর বাবুর বিবাহে আর বিশেষ কোন বাধা রহিল না। এ বিবাহে কিন্তু আমার স্বামীর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তাঁহার পূর্ব্বাপর ইচ্ছা ছিল, ডগ্‌লাস সাহেবের সহিত মনোরমার বিবাহ হয়; সে আশা পূর্ণ হইল না দেখিয়া তিনি কথঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছিলেন। কন্যা তাঁহার অভিলাষের বিরুদ্ধাচারিণী হইল বলিয়া, তিনি তাহার উপরে কথঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়াছিলেন। যজ্ঞেশ্বর বাবুকে তিনি পূর্ব্বে যে চক্ষে দেখিতেন এখন আর সেরূপ দেখিতেন না। আমি অনেক সাধ্যসাধনা করার পর এই বিবাহে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন।

"এই বিবাহে তাঁহার এইরূপ অনভিমত দেখিয়া, মনোরমা ও যজ্ঞেশ্বর বাবু উভয়েই কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। আমার স্বামী অনেকবার আমাকে বলিয়াছিলেন, 'দেখ, এই বিবাহে আমার আদৌ মত নাই। তবে তোমার ও মনোরমার জেদে আমি এই কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি। ভবিষ্যতে যদি কোনরূপ অশান্তি উপস্থিত হয়, আমি তাহার জন্য তিলমাত্রও দায়ী হইব না। আরও যজ্ঞেশ্বর বাবুর সচ্চরিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা, ও ভদ্র ব্যবহারে আমি অত্যন্ত পরিতুষ্ট। সেইজন্য এই পরিণয়ে আমি বিশেষ কোন বাধা উপস্থিত করিতেছি না। এরূপ সচ্চরিত্র ও ভদ্রলোকের সহিত আমার কন্যার বিবাহ হইলে আমাদের মুখোজ্জ্বল হইবে।'

"এইরূপে আমি আমার স্বামীর মতের বিরুদ্ধে ও মনোরমার সুখের জন্য যজ্ঞেশ্বর বাবুর সহিত তাহার বিবাহের পক্ষপাতী হইয়াছিলাম। কি ভয়ানক বিপজ্জাল আমাদের মস্তকের উপর ক্রীড়া করিতেছিল, তাহা আমরা তখন আদৌ চিন্তা করি নাই। এই বিপত্তরঙ্গে মনোরমা ও যজ্ঞেশ্বর বাবুর সুখের আশা একবারে চূর্ণীকৃত হইয়া গেল। দুঃখের

বিষয় এই যে, আমার পুত্র নবীনই মনোরমার এই অশান্তি ও বিপদের মূলীভূত কারণ হইয়া দাঁড়াইল। মনোরমা ও যজ্ঞেশ্বরের কোন অপরাধ নাই। নবীনই এই সর্ব্বনাশের মূল।

"নবীন যতদিন শিবপুরে ছিল, আমার স্বামী তাহাকে ততদিন বড় ঘৃণা করিতেন। কারণ সে সময়ে নবীনের চরিত্রে সকল প্রকার দোষ জন্মিয়াছিল, উন্নতির আর কোন আশা ছিল না। তাহার পর নবীন লেখাপড়া ছাড়িয়া বাড়ীতে আসিয়া রহিল, কোন কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা করিল না। রাত্রিতে নবীন প্রায়ই বাড়ীতে থাকিত না, অথবা অধিক রাত্রে বাড়ীতে আসিত। আমার স্বামী নবীনকে এইরূপ ব্যবহারের জন্য কত তিরস্কার করিতেন, কত বুঝাইতেন, কত সদুপদেশ দিতেন, কিন্তু নবীন তাঁহার কোন কথারই উত্তর দিত না। কোথায় যাইত, কোথায় থাকিত, কি করিত, তাহা কেহই জানিত না। কখন কখন নবীন দুই-একটা কারণ নির্দ্দেশ করিত বটে; কিন্তু আমার স্বামী তাহা বিশ্বাস করিতেন না।

"নবীনের নিকট কোন কথা বাহির করিতে না পারিয়া মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। কারণ আমার স্বামী জানিতেন, নবীন ও মনোরমা উভয়ের বড় সদ্ভাব। মনোরমা নবীনের বিষয় জানিতে পারে, এই ভাবিয়া আমার স্বামী মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মনোরমা কোন কথাই প্রকাশ করিতে স্বীকৃত না হওয়াতে আমার স্বামী বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার নিজগৃহেই তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র হইয়াছে; সে ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা যজ্ঞেশ্বর বাবু, এবং তাঁহার পুত্র নবীন ও কন্যা মনোরমা যজ্ঞেশ্বর বাবুর কুহকে ভুলিয়া, এই ষড়যন্ত্রে সাহচর্য্য করিতেছে। এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, বলিয়াই তিনি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে দেখিতে পারিতেন

না এবং তাঁহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেন না। এমন কি যজ্ঞেশ্বর বাবু এ বাড়ীতে আসিলেও যেন তিনি বিরক্ত হইতেন।

"যদি সেই সময়ে আমার স্বামী নবীনের পশ্চাতে লোক লাগাইতেন, তাহা হইলে হয় ত তিনি বুঝিতে পারিতেন, নবীন কোথায় যায় বা কি করে। হয় ত তাহা হইলে এ সর্ব্বনাশ ঘটিত না; কিন্তু তিনি এত একরোকা ও একগুঁয়ে লোক যে, এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে অপমান বোধ করিয়াছিলেন। কাজেকাজেই নবীনকে সর্ব্বনাশের পথ হইতে ফিরাইবার কোন উপায় ছিল না।

"কখন কখন নবীন অনেকদিন ধরিয়া বাড়ী আসিত না। কোথায় থাকিত, তাহা কেহ বলিতে পারিত না—তাহার সন্ধান কেহ দিতে পারিত না; কিন্তু এই অনুপস্থিতির কালেও নবীন, মনোরমাকে প্রায় প্রতিদিন পত্র লিখিত। সেই সকল চিঠীপত্র আমার স্বামী কখন কখন মনোরমার নিকট চাহিতেন। মনোরমা বলিত, 'বাবা! আপনি এর কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। আমরা সাধারণ লোকের মত পত্রাদি লিখি না। আমাদের পত্র লেখার ধরণ অন্য প্রকার। আমরা দুইজন ছাড়া এ পত্র লিখিবার ধরণ আর কেহ জানে না। আমাদের পত্র পড়িয়া কেহই বুঝিতে পারিবে না, পত্রে কি লেখা আছে।'

"আমার স্বামী মনোরমার কথা শুনিতেন না, পত্রগুলি দেখাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। মনোরমা পত্র দেখাইত; কিন্তু পড়িয়া শুনাইত না। হয় ত প্রতিপত্রেই এমন কোন কথা থাকিত, যাহা শুনিলে পিতা রাগ করিতে পারেন। এই ভয়ে মনোরমা তাহার ভাবার্থ বলিতেও অস্বীকার করিত; ইহাতে আমার স্বামী আরও রাগান্বিত হইয়া যজ্ঞেশ্বর বাবুর শরণাপন্ন হয়েন।

"একদিন তিনি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে নিজ কক্ষে ডাকাইয়া নিভৃতে

জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি আমার কন্যার অতি বিশ্বাসের পাত্র, সে তোমায় সম্মান করে, এবং বোধ হয়, সকল কথা বলে। তুমি আমায় বলিতে পার, মনোরমা ও নবীন কি লেখালেখি করে,আর কেন তাহারা আমার কাছে সে সকল কথা প্রকাশ করে না ?'

"যজ্ঞেশ্বর বাবু তাহাতে উত্তর করেন, 'আমি এ বিষয় অনেক কথা জানি বটে, কিন্তু মনোরমার কাছে আমি বিশ্বাসঘাতক হইতে পারি না। সে সকল কথা আমি আপনাকে বলিব না।'

"আমার স্বামী যজ্ঞেশ্বর বাবুর এই কথায় অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেও তখনকার মত ক্রোধ-সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'নবীন আজ প্রায় মাসাবধিকাল বাড়ী হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তুমি তাহাকে ইহার মধ্যে কোথাও দেখিয়াছ কি ?'

"যজ্ঞেশ্বর বাবু উত্তর করেন, 'হাঁ দেখিয়াছি, একথা আমি স্বীকার করি ; কিন্তু আর কোন কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না। আর কোন কথার উত্তর আমি দিতে পারিব না।'

"যজ্ঞেশ্বর বাবুও বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। মনোরমা তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া তবে গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়াছিল। কাজেকাজেই যজ্ঞেশ্বর বাবু কোন প্রকারে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারেন নাই।

"যজ্ঞেশ্বর বাবুর এই ব্যবহারে আমার স্বামী এত রাগান্বিত হইয়াছিলেন যে, তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বলেন,'তুমি আজ হইতে আর আমার বাড়ীতে আসিও না। মনোরমার সহিত তোমার বিবাহে আমি যে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলাম, তাহা আমার অসম্মতিতে পরিণত হইল জানিবে। আমার এই অনুজ্ঞার পর এখনও যদি তুমি আমার কন্যার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখ, তাহা হইলে আমি তোমাকে অত্যন্ত ইতর বলিয়া বিবেচনা করিব। যদি তুমি আমার কথা

অগ্রাহ্য করিয়া মনোরমার সহিত সম্প্রীতি রাথ, তাহা হইলে আমি মনোরমাকেও বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিব, আর আমার সে কঠোরতার জন্য কেবল তুমিই দায়ী হইবে। মনোরমাকে যদি পথের ভিখারিণী করিতে না চাও, তবে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিও। আমাকে তুমি অত্যন্ত কঠোর ও নিষ্ঠুর বলিয়া বিবেচনা করিতে পার, কিন্তু আমার কার্য্যকলাপ কিছুমাত্র অন্যায় নয়। যে সকল গুপ্তকথা তোমরা আমার নিকটে লুকাইয়া রাখিতেছ, আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে কোন জঘন্য ও ঘৃণিত বিষয় আছে। তাহা না হইলে তোমরা সে সকল কথা চাপিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিবে কেন? ভাল হইলে সে সকল কথা তোমরা স্বেচ্ছায় আমার নিকটে প্রকাশ করিতে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমার শেষ কথা এই, তোমার যেন স্মরণ থাকে যে, তোমার নিজ বিবেচনার উপরে মনোরমার সুখ ও দুঃখ সমস্তই নির্ভর করিতেছে। শুধু মনোরমার নহে, মনোরমার মাতা এবং আমার নিজের মানসিক কষ্টও ইহার উপরে নির্ভর করিবে।'

"ইহা ভিন্ন যজ্ঞেশ্বর বাবুর সহিত তাঁহার আরও অনেক কথা হইয়াছিল। আমার স্বামী ক্রোধের বশে অনেক রূঢ় কথাও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু মনোরমার খাতিরে তাহার পিতাকে সর্ব্ববিষয়ে মার্জ্জনা করিয়াছিলেন, প্রত্যুত্তরে ভ্রমেও একটি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। যজ্ঞেশ্বর বাবু যেরূপ নীরবে আমার স্বামীর কটুকাটব্য সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা মনে হইলে আজ পর্য্যন্ত আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হয়।

"যখন যজ্ঞেশ্বর বাবু চলিয়া যান, তখন তিনি বাহিরে আসিয়া আমায় বলিয়াছিলেন, 'মা! এ সব বাক্যবাণ আমায় সহ্য করিতে হইবে। যদি ইহার জন্য আমার জীবনের সমস্ত সুখ নষ্ট হয়, তাহা হইলেও আমি

আপনার স্নেহের মনোরমাকে এক দণ্ডের জন্যও ভুলিব না, জানিবেন। মনোরমাকে এবং আপনাকে আমি প্রায়ই পত্রাদি লিখিব; কিন্তু সে সকল পত্র আর আপনাদের এ বাড়ীর ঠিকানায় আসিবে না। রাধারমণ বাবুর কন্যার সহিত মনোরমার বড় সদ্ভাব। মনোরমা চেষ্টা করিলে অবশ্য এ বিষয়ে এমন বন্দোবস্ত করিতে পারে যে, আমার চিঠীপত্র আপনাদের নামে অথচ তাহার ঠিকানায় পৌঁছিবে। সে আবার লোক মারফৎ তাহা গুপ্তভাবে আপনাদের কাছে পাঠাইয়া দিবে, আমার এ ক্ষুদ্র জীবন আমি মনোরমার পবিত্র স্মৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিলাম। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তাহার দেবীমূর্ত্তি আমার হৃদয়মধ্যে অঙ্কিত থাকিবে। কি করিব, আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। জগতে আসিয়াছি—অনেক সহ্য করিতে হইবে। মনোরমার জন্য আমি সকল অত্যাচার অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে সহ্য করিতে পারিব। যে আপনার হিতাহিত বুঝিয়া এ মরজগতে আপনার কর্ত্তব্য পালন করে, সেই মানুষ। আপাততঃ আন্তরিক দুঃখের সহিত আমি আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি।'

"সেইদিন হইতেই আর আমি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে দেখি নাই। তার পর একদিন সহসা শুনিলাম, তিনি এক নীচ-কুলোদ্ভবা রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন। ভাবিলাম, যদি এই কথা মনোরমার কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে সে একেবারে মর্ম্মাহত হইবে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, একদিন আমি মনোরমার জন্য কতকগুলি খাবার লইয়া তাহার ঘরে যাই, গিয়া দেখি, মনোরমা বিছানায় পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। আমি তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিলাম। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে নিজেই আমাকে বলিল, 'মা! যজ্ঞেশ্বর বাবু আর একজন সৌভাগ্যশালিনী রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন। এখন



"দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে।"

[হরতনের নওলা—১১২ পৃষ্ঠা।

Lakshmibilas Press.

হইতে তাঁহার উপরে আমার আর কোন অধিকার নাই। এ জন্মে তাঁহার সহিত আমার মিলন হওয়া আর সম্ভবপর নয়। তথাপি আমি তাঁহাকে কোন দোষ দিতে পারি না। এ পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় প্রকৃতির লোক আর কেহ আছেন কি না সন্দেহ। যদিও তিনি এখন অপরের স্বামী, তথাপি আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিব। এক দুঃখ এই, এ জন্মে তাঁহার সেবা করিতে পাইলাম না।'

"অভাগিনী মনোরমা এই পর্য্যন্ত বলিয়া আকুলহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে অনেক বুঝাইলাম, অনেক সান্ত্বনার পর বলিলাম, 'মা মনোরমা! তুমি বালিকা নও, তোমায় আর অধিক বুঝাইব কি—কালে হয় ত তোমার অধিকতর সুখ হইতে পারে। হয় ত তোমাদের উভয়ের মিলন ভগবানের অভিপ্রেত নয়—হয় ত তোমার কপালে আরও সুন্দর, আরও ধনবান্ ও গুণবান্ পতিলাভ বিধাতার নির্ব্বন্ধ—হয় ত ভবিষ্যতে তুমি আরও সুখিনী হইবে——'

"আমার কথায় বাধা দিয়া মনোরমা বলিল, 'মা! সে কি কখনও সম্ভব? আমার ভবিষ্যৎ দারুণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। যজ্ঞেশ্বর বাবু ছাড়া আমি কি কখনও আর কাহারও পদে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে পারি? এ জীবনে আমি কি আর কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারি? মা! আমি ত আর কাহাকে বিবাহ করিব না।'

"আমি মনোরমাকে আর কিছু বলিলাম না। সে তখনকার মত আমার নিকট হইতে চলিয়া গেল। অল্প দিনের মধ্যেই আমি জানিতে পারিলাম যে, যজ্ঞেশ্বর বাবু অন্য রমণীকে বিবাহ করিলেও মনোরমাকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি বিবাহিত অবস্থায়ও, অবিবাহিতা কুমারী মনোরমাকে প্রেমপত্র লিখিতে লাগিলেন। ইহাতে আমি অত্যন্ত রুষ্ট হইলাম।

"মনোরমার সমবয়স্কা এক খুড়তুতো ভগ্নী আছে, সে রাধারমণ বাবুর কন্যা। তাহারই ঠিকানায় যজ্ঞেশ্বর বাবু, মনোরমাকে পত্র লিখিতেন। সে আবার সেই পত্র হয় নিজে আসিয়া মনোরমার হাতে দিত, নয় অতি গুপ্তভাবে লোক মারফৎ মনোরমাকে পাঠাইয়া দিত। সুতরাং ডাকে মনোরমার নামে কোন চিঠী-পত্র আসিত না বলিয়া, আমার স্বামী এ সকল কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই।

"একদিন আমি মনোরমাকে এ সম্বন্ধে আভাসে জিজ্ঞাসা করাতে সে আমাকে বলিয়াছিল, 'আমরা উভয়ে এখনও চিঠী লেখালেখি করিয়া থাকি। যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকট হইতে আমার অনেক চিঠী-পত্র আসিতে পারে; আমিও তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতে পারি। তোমার হাতে যদি কোন চিঠী পড়ে, তা'হলে তুমি তাহা বাবার কাণে তুলিও না। যজ্ঞেশ্বর বাবু এখন অপরের স্বামী। তাঁহাকে আমার পত্রাদি লেখা অন্যায় মনে করিতে পার; কিন্তু বাস্তবিক এই লেখালেখিতে দোষের কিছুই নাই। হয় ত একদিন জানিতে পারিবে, আমি যাহা কিছু করিতেছি, সকলই ভালর জন্য।' প্রথমতঃ যদিও আমি বড় রাগান্বিত হইয়াছিলাম, কিন্তু মনোরমার কথায় আমি সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। মনোরমাকে আমি বড় বিশ্বাস করিতাম। আমার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সে কথনই আমার কাছে মিথ্যাকথা কহিবে না। আমি তাহার অনুরোধে তাহার পিতাকে সেইজন্য এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিলাম না। নির্ব্বিঘ্নে মনোরমা ও যজ্ঞেশ্বর বাবুর পত্রাদি আসিতে-যাইতে লাগিল।

"এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইল। এই দুই বৎসরের মধ্যে নবীনের অত্যাচার আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। টাকার দরকার ভিন্ন সে প্রায়ই বাড়ীতে আসিত না। অনেকবার দেখিয়া যখন তাহার পিতা আর তাহার কোন ছলনায় ভুলিলেন না—কিছুতেই আর তাহার হাতে

টাকাকড়ি দিতে চাহিলেন না, তখন নবীনের আসা-যাওয়া একেবারেই বন্ধ হইল ; সে যেন একেবারেই আমাদের ভুলিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তাহার পাওনাদারগণ দেখা দিতে লাগিল। দুই শত, পাঁচ শত হইতে দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হেণ্ডনোটের দেনা বাহির হইয়া পড়িল। বিপদ্ দেখিয়া আমার স্বামী নবীনকে ত্যাজ্যপুত্র করিলেন।

"আমাদের এ পরিবারের মধ্যে অনেক কথাই আমার স্বামীর নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিতে হয়। তিনি যে রকম একগুঁয়ে ও এক রোকা লোক, তাহাতে তাঁহার নিকট সকল কথা প্রকাশ করাও বিপজ্জনক। নবীনকে তিনি ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমি তাহার মায়া-মমতা কাটাইতে পারি নাই। তিনি পুরুষ মানুষ, তাঁহার কঠোর প্রাণ, তিনি অনায়াসেই পুত্রের প্রতি মমতাহীন হইতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা পারি নাই। আমার স্বামীর অজ্ঞাতে আমি নবীনের সহিত দুই-চারিবার দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।

"মনোরমাকে তাহার পিতা অনেক বহুমূল্য জড়োয়ার গহনা কিনিয়া দিয়াছিলেন। একদিন এই বাড়ীতে একটা ভোজ-উপলক্ষে আমার স্বামী মনোরমাকে সেই সকল হীরা-জহরতের গহনা পরিতে বলেন। বিশেষতঃ তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি যে এক জোড়া হীরের বালা মনোরমাকে কিনিয়া দেন, সেদিন সেই বালা জোড়াটি পরিতে বার বার বলিয়া দিয়াছিলেন। মনোরমা কিন্তু ভোজের সময়ে সে বালা পরে নাই। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের সম্মুখে যদিও তিনি মনোরমাকে কিছু বলেন নাই, কিন্তু মনোরমা তাঁহার কথা অমান্য করিয়াছিল বলিয়া পরে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলেন। এমন কি মনোরমাকে অবিশ্বাস করিয়া তিনি সেই বালা দেখিতে চাহিয়াছিলেন এবং মনোরমা কেন তাঁহার কথা অমান্য করিয়াছিল, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

তাহাতে মনোরমা বলিল, 'বাবা! আপনি রাগ করিবেন না। আমার সোনা, হীরা, জড়োয়ার এত গহনা আছে যে, সমস্তগুলি পরিয়া নড়িয়া বেড়ান দুষ্কর। সকল দিন সকল গহনা না-ই পারিলাম।'

"আমার স্বামী বলিলেন, 'কিন্তু হীরের বালা জোড়াটি পরিতে আমি তোমায় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম। সেটি কি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে? যদি ভাঙ্গিয়া থাকে, তাহা হইলে আমায় বল নাই কেন? আমায় সে বালা জোড়াটি আনিয়া দেখাও।'

"আমি দেখিলাম, মনোরমা বড় বিপদে পড়িয়াছে। সে ক্রমাগত এ দায় হইতে এড়াইতে এবং তাহার পিতাকে অন্য কথায় ভুলাইবার চেষ্টা পাইতেছে; কিন্তু আমার স্বামী কিছুতেই ভুলিবার লোক নহেন, তিনি চিরকাল ভয়ানক একগুঁয়ে লোক, যাহা একবার ধরিবেন, তাহা সহজে ছাড়িবেন না। বালা জোড়াটি দেখিবার জন্য তিনি বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। অনেক কথা কাটাকাটির পর বাধ্য হইয়া মনোরমা স্বীকার করিল যে, সে বালা জোড়াটি কোন কারণে হস্তান্তরিত হইয়াছে। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া আমার স্বামী মনোরমাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন কথাই বাহির করিতে পারিলেন না—মনোরমা সে বালা জোড়াটি কোথায় যে রাখিয়াছে বা কাহাকে দিয়াছে, তাহার কোন সূত্রই পাইলেন না। তাঁহার তখন বড় সন্দেহ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার ক্যাস-বাক্সে কত টাকা আছে, আমি দেখিতে চাই। ক্যাস-বাক্সটি আমার কাছে লইয়া এস।' মনোরমা ক্যাস-বাক্স আনিলে পর তিনি দেখিলেন, তাহাতে তিনটি মাত্র টাকা পড়িয়া আছে।

"তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই তিনটি টাকা বৈ তোমার কাছে আর কিছুই নাই?'

মনোরমা বলিল, 'না।'

"তিনি বলিলেন, 'সে কি ? কাল যে তুমি আমার কাছে দুই শত টাকা চাইলে, আমি তোমাকে দিলাম। সে সব টাকা এত শীঘ্র কোথায় গেল ?'

"মনোরমা এ কথারও কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না। আমার স্বামী তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি যেদিন শুনিলাম, যজ্ঞেশ্বর একটা ছোট ঘরের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে, তখন মনে হইয়াছিল যে, আমার পরিত্রাণ হইল—আমি বাঁচিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা হয় নাই। তুমি এখনও তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছ। আমি দেখিতেছি, তোমরা আমায় অগ্রাহ্য কর—আমার মান অপমান, আমার ভাল মন্দ, সমস্তই অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে কর। তোমরা সকলে মিলিয়া আমার বিপক্ষে যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে, এখনও সব ঠিক সেই রকম বজায় আছে। ধিক্ ! আমার ছেলে মেয়ে, একটাও আমার মনের মত হইল না। একটাও আমার মর্য্যাদা বুঝিলে না। আমি যে এত যত্নে করে, এত আদরে তোমাদের প্রতিপালন করিলাম,এখন বড় হইয়া তোমরা সে সব ভুলিয়া গেলে ? যাও, মনোরমা,তুমি আমার চোখের সাম্‌নে থেকে সরিয়া যাও। তোমায় দেখিয়া আমার রাগ ক্রমাগতই বাড়িয়া উঠিতেছে। এই মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে আমি সেই হীরের বালা জোড়াটি অবশ্যই দেখিতে চাই। দেখাইতে পার ভালই, নয় আমায় বলিতে হইবে, তুমি সে বালা কি করিয়াছ, কি কাহাকে দিয়াছ ? যদি হারাইয়া থাক—খুঁজে দেখ।'

"সেই মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই মনোরমা তাহার পিতাকে হীরের বালা জোড়াটি দেখাইয়াছিল বটে, কিন্তু আমি জানিতাম যে, তৎপরিবর্ত্তে মনোরমার অন্যান্য বহু মূল্যবান্ গহনা হস্তান্তরিত হইয়াছিল।"

ডাক্তার অম্বিকাচরণ বাবু যখন বুঝিতে পারিলেন যে, মনোরমার মাতা মনোরমা সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা সমস্তই বলিয়াছেন, তখন তিনি হরিদাস গোয়েন্দা পূর্ব্বদিনে তাঁহাকে যে প্রকার শিখাইয়া দিয়াছিলেন, সেই ভাবে মনোরমার মাতাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

অম্বিকাচরণ জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার কন্যা মনোরমা ছাব্বিশে আষাঢ় তারিখ হইতে পীড়িতা হইয়াছেন, কেমন? সহসা এরূপ পীড়াগ্রস্ত হইবার কারণ কি বলিতে পারেন?"

মনোরমার মাতা উত্তর করিলেন, "না, তাহা কিছু বলিতে পারি না। ছাব্বিশে আষাঢ় সকালে আমি তাহার ঘরে গিয়া দেখিলাম, তাহার ভয়ানক জ্বর হইয়াছে, সেই জ্বরে সে বেহুঁস হইয়া শয্যায় পড়িয়া আছে।"

"অবশ্য তৎক্ষণাৎ আপনি ডাক্তার আনাইয়াছিলেন। ডাক্তার আসিয়া কি বলিয়াছিলেন?"

"ডাক্তার সাহেব আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভিজে কাপড় অনেকক্ষণ পরিয়া থাকা বা অন্য কোন কারণে বিশেষ ঠাণ্ডা লাগিয়া এই জ্বর উপস্থিত করিয়াছে।"

"তাহা হইলে আমায় ধরিয়া লইতে হইতেছে যে, পঁচিশে আষাঢ় তারিখে মনোরমা ভিজে কাপড়ে ছিল বা অন্য কোন কারণে তাহার বিশেষ ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল?"

"কই, সেদিন ত ভিজা কাপড় পরিয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয় না।"

"আমার বেশ স্মরণ হইতেছে যে, পঁচিশে আষাঢ় তারিখে দিন রাত —কোন সময়ে গুঁড়ি গুঁড়ি, কোন সময়ে বা মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল। যদি মনোরমাকে আপনি বাড়ীতে ভিজা কাপড়ে থাকিতে না দেখিয়া

থাকেন, তাহা হইলে আপনি বলিতে পারেন কি, সেদিন কোন সময়ে মনোরমা বাড়ীর বাহির হইয়াছিল কি না ?”

"হাঁ, আমার স্মরণ হইতেছে, মনোরমা পঁচিশে আষাঢ় তারিখে রাত্রি সাড়ে নয়টা কিম্বা দশটার পর বাড়ীর বাহির হইয়াছিল। রাত্রি একটার পূর্ব্বে সে ফিরিয়া আসে নাই। আমার স্বামী এ কথা জানিতে পারেন নাই বা আমি তাঁহাকে জানিতে দিই নাই। পাছে তিনি কন্যার উপরে কোন প্রকার ঘৃণিত সন্দেহ করেন, এই ভয়ে আমি সে কথা তাহার নিকটে প্রকাশ করি নাই। যখন মনোরমা ফিরিয়া আসে তখন তাহার মলিন মুখ দেখিয়া আমি মনোরমাকে সেজন্য কোন তিরস্কার করি নাই বা কোন কথা বলি নাই। মনোরমা নিজ কক্ষে গিয়া শয়ন করে এবং পরদিন প্রাতে তাহার ঐরূপ কঠিন পীড়া দেখিতে পাই।”

“এই জ্বরের অবস্থায় মনোরমা একদিনও ইহার মধ্যে কোন সংবাদ-পত্র পাঠ করে নাই ?”

“না। সে বরাবরই অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছে। সংবাদ-পত্র পড়িবে কি করিয়া ?”

“তাহা হইলে যজ্ঞেশ্বর বাবুর এই মোকদ্দমা ও বিপদের কথা মনোরমা কিছু জানিতে পারে নাই ?”

“না। এ সকল কথা তাহার জানা সম্ভব নয়।”

“জ্বরের অবস্থায় মনোরমার নামে কোন চিঠী-পত্র আসিয়াছিল কি ?”

“হাঁ, দুইখানি পত্র আসিয়াছিল। একখানি যজ্ঞেশ্বর বাবুর ও আর একখানি নবীনের হস্তলিখিত।”

“সে পত্র দুইখানি আপনার কাছে আছে ?”

“আছে।”

"আপনি সেগুলি খুলিয়াছিলেন ?"

"না। আমি তাহার কোন চিঠী কখনও খুলিয়া পড়ি না।"

অম্বিকাচরণ বলিলেন, "কিন্তু এখন আপনার কন্যা জীবন সঙ্কটাবস্থায় পতিতা। এ সময়ে কোন জিনিষ এরূপভাবে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। আমি সে পত্র দুইখানি দেখিতে চাই। আপনি পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে যদি অন্যায় বিবেচনা করেন, আমি সে ভার নিজ মস্তকে বহন করিতে প্রস্তুত আছি। এ ছাড়া আপনাকে আর একটি কাজ করিতে হইবে। আপনার কন্যার গৃহে লিখিবার জন্য যে টেবিল আছে, আমি তাহার চাবি চাই। কেন আমি এ সকল গুপ্ত বিষয় জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি, তাহার কারণ আপনাকে এখন বলিতে পারি না। আপনার কন্যার মানসিক ব্যাধির কারণ না জানিতে পারিলে আমি কোন চিকিৎসাই করিতে পারিব না।"

মনোরমার মাতা দায়ে পড়িয়া ডাক্তার অম্বিকাচরণ বাবুকে মনোরমার কক্ষে লইয়া গেলেন। তথায় টেবিলের একটি টানার মধ্যে আরও দুইখানি পত্র পাওয়া গেল। সেগুলি নবীনের নিকট হইতে আসিয়াছে, হস্তাক্ষরে তাঁহার প্রমাণ পাওয়া গেল। পোষ্ট আফিসের ছাপে তাহার তারিখ ধরা পড়িল।

অম্বিকাচরণ বাবু চিঠী দুইখানি খুলিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মনোরমার মাতাও তাঁহাকে পত্রপাঠ-সম্বন্ধে কোন সাহায্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি সে বিষয়ে নিরাশ হইয়া টেবিলের টানায় আর কিছু আছে কি না, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি তাহার মধ্যে আবশ্যক বস্তু আর কিছু পাইলেন না। কেবল তিনখানি হরতনের নওলা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। মনোরমার মাতাও তদ্দর্শনে বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু সে বিষয়ে কোন

কথা বলিতে পারিলেন না। অম্বিকাচরণ বাবু বলিলেন, "এই তাস কয়খানি আর এই পত্র কয়খানি আমি লইয়া যাইব।"

তাহাতে মনোরমার মাতা কোন আপত্তি উত্থাপন করিলেন না। তাহার পর অম্বিকা বাবু মনোরমার পীড়ার অবস্থা বিশেষ করিয়া দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া আসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব্যারিষ্টার নিকলাস সাহেবের নিকট আসিয়া ডাক্তার অম্বিকাচরণ বাবু পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনা সকল বর্ণন করিয়া বলিলেন, 'আমি সেই চিঠীগুলি ও হরতনের নওলা তিনখানি লইয়া এখন তোমার কাছে আসিয়াছি। এখন যাহা করিবার হয়, তাহা তুমি কর বা হরিদাস গোয়েন্দার উপরে সম্পূর্ণ ভার দাও। তুমি বলিয়াছিলে, এই হরতনের নওলাই এই গুপ্ত রহস্যের মূল সূত্র এবং যদি হয়, ইহাতেই যজ্ঞেশ্বর বাবুর নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইবে। যাহাই হউক, এ বড় আশ্চর্য্যের কথা যে, মনোরমায় টেবিলের ভিতরেও হরতনের নওলা আর যজ্ঞেশ্বর বাবুর আল্‌ষ্টার কোটের পকেটেও হরতনের নওলা! না জানি এ হরতনের নওলাতেই কি আছে?"

হরিদাস গোয়েন্দা সেইখানেই বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "বড় সোজা কথা নয়! পঁচিশে আষাঢ় তারিখে রাত্রিকালে মনোরমা বাড়ীর বাহির হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সেইদিন রাত্রি দশটার পরে গোলদীঘীর সম্মুখে যে রমণীর সহিত যজ্ঞেশ্বর বাবু গাড়ীতে উঠিয়া ঠন্‌ঠনের হোটেলে গিয়াছিলেন, তিনি এই মনোরমা ভিন্ন আর

কেহই নয়, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। এখন আর বেশী কথা বলা উচিত নয়; কিন্তু এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে যে, আমায় বিশেষ কোন ক্লেশ পাইতে হইবে না, এ কথা আমি আপনাদের সম্মুখে সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি।"

নিকলাস সাহেব বলিলেন, "আমারও বেশ বিশ্বাস হইতেছে যে, এখন আপনার কাজ সোজা হইয়া আসিল।"

ডাক্তার অম্বিকাচরণ বাবু হরিদাস গোয়েন্দার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কাল আমি মনোরমাকে দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। হয় ত আপনি সে সময়ে আমাকে আপনার এতদিনের গোয়েন্দাগিরির অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারিবেন।"

হরিদাস। সে কথা এখন সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

অম্বিকা। অন্ততঃ এরূপ আশা করিতে পারেন ত?

হরিদাস। পারি।

অম্বিকা। তাহা হইলেই যথেষ্ট। এখন আমি চলিলাম। বিশেষ কোন আবশ্যক আছে।

নিকলাস। ডাক্তারের বিশেষ আবশ্যক সকল সময়েই।

অম্বিকা। বিশেষতঃ যদি সঙ্কটাপন্ন, মুমূর্ষু কোন রোগী হাতে থাকে।

এই বলিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। নিকলাস সাহেব হরিদাস গোয়েন্দাকে বলিলেন, "এখন আমি এ বিষয়ের সমস্ত ভার আপনার উপরে অর্পণ করিলাম। আশা করি, আপনি অতি সত্বরেই এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিবেন।"

তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরিদাসের কথা

ব্যারিষ্টার নিকলাস সাহেবের বুদ্ধিতে আর কুলাইল না। তিনি আমার উপরে সমস্ত ভার অর্পণ করিলেন।

আমি সর্ব্বপ্রথমেই পত্র কয়খানির মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইলাম। একখানি পত্রে যজ্ঞেশ্বর বাবুর হস্তাক্ষর ও পোষ্টাফিসের তারিখ দেখিয়া আমি অনুভবে স্থির করিলাম যে, সেইখানিই ডাকে ফেলিয়া দিবার জন্য যজ্ঞেশ্বর বাবু প্রদান করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানে গিয়া নিকলাস সাহেব তাহা ডাকে ফেলিয়া দেন। মনোরমার টেবিলের টানার মধ্যে যে দুইখানি পত্র পাওয়া গিয়াছিল, সেই দুইখানি ডাক্তার অম্বিকাচরণ বাবু খুলিয়াছিলেন, কিন্তু পত্রপাঠ করিয়া কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। কাজেকাজেই আর দুইখানি পত্র—যাহা তিনি মনোরমার মাতার নিকটে পাইয়াছিলেন, তাহা উন্মোচন করেন নাই। তাহারই মধ্যে যজ্ঞেশ্বর বাবুর সেই পত্রখানিও ছিল।

যে দুইখানি পত্র অম্বিকাচরণ বাবু খুলিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে পোষ্টাফিসের তারিখ দেখিয়া একখানি লইয়া আমি পাঠ করিতে

যে দুইখানি পত্র অম্বিকাচরণ বাবু খুলিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে পোষ্টাফিসের তারিখ দেখিয়া একখানি লইয়া আমি পাঠ করিতে বসিলাম। অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়াও তাহার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারিলাম না। পাঠকগণের বিদিতার্থ নিম্নে সেই পত্রের অবিকল নকল দিলাম।

চ ৯ ঞ ৮ দ ১৫ শ ১৪ ট ২০ ব ১৩

নাই	আত্মহত্যা	জোড়াটি	জুয়া	
আর	পাখী	কেমন	বেড়ায়	উপায়
সব	হীরের	আছ	হাতে	
গুলি	ভাল	একটিও	স্বাধীন	বেশ
রজনীতে	তুমি	কোন	টাকা	
উড়িয়া	করিব	পাঠাবে	দেখিনা	নচেৎ
হারিয়াছি	বালা	তারা	খেলায়	

ত ১৭ ম ৬ ক ৪ ধ ১ ঠ ২ য ২২ ঝ ৬

আমি প্রথমেই ভাবিতে লাগিলাম যে, পত্রখানির চারিধারে বর্ণ ও নম্বর সাজান বর্ডারের সহিত পত্রের আসল কথাগুলির কোন সম্পর্ক আছে কি না। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর স্থির করিলাম যে, শুধু বাহারের জন্য এত যত্ন করিয়া বর্ণ ও নম্বর কখনই সাজান হয় নাই। তবে এমন হইতে পারে যে, অন্য কেহ এ পত্র দেখিয়া, যাহাতে আরও ভ্রমাত্মক পথে চালিত হয়েন, সেই উদ্দেশ্যে হয় ত, এইরূপভাবে পত্রখানির চারিধার সাজান হইয়াছে।

যাহা হউক, আসল পত্রখানি নষ্ট হইবার ভয়ে, আমি সেই পত্রের দুইখানি অবিকল নকল করিলাম। বর্ডারটি মানাইবার জন্য একগাছি রুল অনুসন্ধান করিলাম—টেবিলের উপর খুঁজিয়া পাইলাম না। অথচ পত্রখানি ছাড়িয়া রুল অনুসন্ধানে উঠিতেও ইচ্ছা হইল না। ডাক্তার অম্বিকাচরণ বাবু মনোরমার টেবিলের মধ্য হইতে যে তিনখানি তাস লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে একখানি তুলিয়া লইয়া রুলের কার্য্য সারিলাম অর্থাৎ তাসখানি সোজা করিয়া কাগজের উপর রাখিয়া পত্রখানির চতুর্দ্দিকে ডবল লাইন টানিয়া লইয়া, তাহার ভিতর বর্ণ ও নম্বর পাশাপাশি, অবিকল মূল পত্রের অনুকরণে লিখিয়া লইলাম।

অনেকক্ষণ ধরিয়া পত্রখানি দেখিতে দেখিতে দুইটি আবশ্যক কথা আমার চোখে পড়িল। একটি, তৃতীয় লাইনের দ্বিতীয় অক্ষর "হীরের" —অপরটি সপ্তম অথবা শেষ লাইনের দ্বিতীয় কথা "বালা"।

দুইটি কথা একত্রে যোগ করিলে "হীরের বালা" হয়। মনে বড় আনন্দ হইল। ভাবিলাম, তবে ত সূত্র পাইয়াছি। হয় ত এই বালা, ভোজের দিন মনোরমা পরে নাই বলিয়া, পিতার নিকট তিরস্কৃতা হইয়াছিল। সূত্র পাইলাম বটে, কিন্তু অর্দ্ধঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও "হীরের বালা"

এই কথার সহিত অন্য কথাগুলি যোগ করিয়া, পত্রখানি পূর্ণাবয়বে খাড়া করিতে পারিলাম না।

তাহার পর সহসা আমার মনে একটা কথার উদয় হইল। সে কথা যে আমি কেন পূর্ব্বে ভাবি নাই, বলিতে পারি না। চক্ষের উপরে যে দ্রব্য রহিয়াছে, তাহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করিয়া, আমি এতক্ষণ যে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিলাম, তাহার জন্য আমার আপনা আপনি, যেন কেমন এক রকম লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। এতক্ষণ সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছি বলিয়া আক্ষেপ জন্মিল। যে হরতনের নওলা লইয়া পূর্ব্বে এত কথা হইয়া গিয়াছে, সেই হরতনের নওলা আমার সম্মুখে পড়িয়া থাকিলেও, তাহার সহিত পত্রের কোন প্রকার সম্পর্ক আছে কি না দেখা আমার পূর্ব্বেই উচিত ছিল।

আমি তখন একখানি হরতনের নওলা পত্রের উপর রাখিলাম। তাহাতে মূল পত্রখানি সমস্তই লুক্কায়িত হইয়া, কেবল চতুর্দ্দিকের বর্ডার ও তন্মধ্যস্থিত বর্ণমালা ও নম্বরগুলি দেখা যাইতে লাগিল। সেইরূপভাবে পত্রখানি চাপা দিয়া আরও কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলাম। মনে হইল যে, হরতনের নওলার ফোঁটা কয়টি যদি আমি কাটিয়া ফেলি, তাহা হইলে হয় ত কতকগুলি কথা দেখা যাইতে পারে। সেই কথাগুলির সাহায্যে যদি পত্রের ভাব অনুমান বুঝিয়া লইতে পারি, তাহা হইলেও যথেষ্ট লাভ। অন্ততঃ নয়টি কথাও যদি তাহাতে বাহির হয়, তাহা হইলে সে কয়টি কথা যেরূপভাবেই থাকুক না কেন, কোন-না-কোন প্রকারে অর্থসংগ্রহ করিবার মত সাজাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

মনোরমার তাসখানি আমি নষ্ট করিলাম না। আমারও সেই রকম তাস একজোড়া ছিল, তাহা হইতেই বাছিয়া হরতনের নওলাখানি বাহির করিয়া লইয়া ফোঁটা কয়টি কাটিয়া ফেলিলাম। টেবিলের

উপরে ফেলিয়া ফোঁটা কয়টি কাটিতে গিয়া, আমার টেবিল স্থানে স্থানে নষ্ট হইয়া গেল। সেদিকে তখন আমার কিছুমাত্র দৃষ্টি পড়িল না। নবীনের সেই চিঠীখানিতে আমার তখন এত অধিক আগ্রহ জন্মিয়াছিল যে, যখন জানিতে পারিলাম, আমার টেবিলটি খারাপ হইয়া গিয়াছে, তখনও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার ইচ্ছা হইল না।

হরতনের নওলাখানির নয়টি ফোঁটা কাটিয়া ফেলাতে যে নয়টি রন্ধ্র হইয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়া মূল পত্রের নয়টি কথা দেখিতে পাওয়া গেল। যথা——

"নাই—জুয়া—সব—হাতে—একটিও—
রজনীতে—টাকা—হারিয়াছি—খেলায়—"

প্রায় বিংশতি বার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে কথাগুলি সাজাইয়া শেষে যাহা দাঁড়াইল, তাহা এই ;—

"হাতে একটিও টাকা নাই। জুয়া খেলায় সব হারিয়াছি। রজনীতে—"

তীক্ষ্ণদৃষ্টি, প্রত্যুৎপন্নমতি ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তির জন্য অন্তরে অন্তরে আপনাকে আপনি যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া শেষে স্থির করিলাম যে, হয় ত নবীন বাড়ী হইতে বিতাড়িত হওয়াতে ও পিতার নিকট হইতে নিজ অসচ্চরিত্রতার দোষে কোন প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারাতে, সহোদরা মনোরমার ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালবাসার উপর নির্ভর করিয়াছিল। অর্থের আবশ্যক হইলেই বোধ হয়, নবীন মনোরমাকে পত্র লিখিত। মনোরমা নবীনকে প্রাণের সহিত ভালবাসে ; সুতরাং সে তাহার সহোদরকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ত্রুটি করিত না।

নবীনের চরিত্রের দোষে তাহার পিতা তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিতে বিন্দুমাত্র ক্লেশ বোধ করেন নাই। প্রবল স্নেহের বশে, মনোরমা সেই সহোদরকে গুপ্তভাবে সাহায্য করিত, ইহাই যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে মনোরমার চরিত্র, আদর্শ চরিত্র বটে।

যাহাই হউক, আপাততঃ সে ভাবনা ত্যাগ করিয়া বর্ডারের বর্ণমালা ও নম্বরগুলির সহিত পরের কথাগুলির কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। পাছে দেখিবার কোন প্রকার গোল হয়, এইজন্য হরতনের নওলার নয়টি বিবরের ভিতর দিয়া যে নয়টি কথা দেখা যাইতেছিল, সেই নয়টি কথা ঠিক সেইরূপভাবে আর একখানি কাগজে তুলিয়া লইলাম। তাহার চারিধারে পূর্ব্বের ন্যায় রুল কাটিয়া বর্ণমালা ও নম্বর অবিকল মূল পত্র হইতে নকল করিলাম। তাহাতে এইরূপ দাঁড়াইল ;—

চ ৯ ঞ ৮ দ ১৫ শ ১৪ ট ২০ ব ১৩

নাই (১)	জুয়া (২)
সব (৩)	হাতে (৪)
একটিও (৫)	
রজনীতে (৬)	টাকা (৭)
হারিয়াছি (৮)	খেলায় (৯)

ভাবিলাম, নম্বর এবং বর্ণমালা লইয়াই যখন এত সাজান-গোজান, তখন নিশ্চয়ই এই নম্বরে কিম্বা বর্ণমালায় পত্রখানি পাঠ করিবার উপায় ও সঙ্কেত আছে। যেমন এই কথা আমার মনোমধ্যে উদিত হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ আমি সেই নয়টী কথার নীচে এক, দুই, তিন, চারি

হইতে নয় পর্য্যন্ত নম্বর দিলাম। নম্বর বসাইয়াই বর্ডারের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, "ক" এর গায়ে ৪ নম্বর লিখিত আছে। আমারও ৪ নম্বর পড়িয়াছে "হাতে" এই কথার উপর। আমার যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হইল, তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। কারণ, নয়টি কথা প্রথমে যাহা "হরতনের নওলার" নয়টি ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়াছিল, তাহা এই ;—

"নাই— জুয়া— সব— হাতে— একটিও—
(১) (২) (৩) (৪) (৫)
রজনীতে—টাকা—হারিয়াছি।—খেলায়—"
(৬) (৭) (৮) (৯)

অনেক কষ্টে, আন্দাজে, আমি উপরোক্ত নয়টি কথা সাজাইয়াছিলাম এইরূপ ;—

(১) (২) (৩) (৪) (৫)
"হাতে একটিও টাকা নাই। জুয়া
(৪) (৫) (৭) (১) (২)

(৬) (৭) (৮) (৯)
খেলায় সব হারিয়াছি। রজনীতে—"
(৯) (৩) (৮) (৬)

পাঠকগণের সুবিধার্থ, আমি অসম্বন্ধ নয়টি কথা লইয়া, আন্দাজে তাহা কেমন করিয়া সাজাইয়াছিলাম, তাহা পুনরায় মিলাইবার জন্য উপরে দেওয়া হইল। অসম্বন্ধ নয়টি কথায় এক হইতে নয় পর্য্যন্ত

নম্বর দেওয়া হইয়াছে। সেই সেই নম্বরের কথাগুলি সাজাইয়া কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, দেখুন ;—

নম্বর	৪	এর	কথাটি	(অর্থাৎ	"হাতে")	হইয়াছে	নম্বর	১
"	৫	"	"	"	"একটিও"	"	"	২
"	৭	"	"	"	"টাকা"	"	"	৩
"	১	"	"	"	"নাই"।	"	"	৪
"	২	"	"	"	"জুয়া"	"	"	৫
"	৯	"	"	"	"খেলায়"	"	"	৬
"	৩	"	"	"	"সব"	"	"	৭
"	৮	"	"	"	"হারিয়াছি।"	"	"	৮
"	৬	"	"	"	"রজনীতে"	"	"	৯

এখন বুঝিলাম ৪, ৫, ৭, ১, ২, ৯, ৩, ৮, ৬, এই নম্বর অনুসারে পড়া যদি আমার জানা থাকিত, তাহা হইলে আমিও অল্প সময়ের মধ্যেই পত্রখানি পাঠ করিতে পারিতাম। তবে আমার বিশ্বাস, এইরূপ বাঁধা নিয়মে, বাঁধা নম্বর অনুসারে বোধ হয় মনোরমা ও নবীন কখনই পত্রাদি লেখালেখি করিত না। হয় ত, কা'র পরে কোন্ নম্বরের কথাটি পড়িতে হইবে, সে বিষয়ে প্রত্যেক বারেই নূতন নূতন সঙ্কেত থাকিত। এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করিবার জন্য আমি নবীনের আর একখানি পত্র মিলাইলাম। বাস্তবিক দেখিলাম, যা' ভাবিয়াছিলাম তাই। প্রত্যেক পত্রে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পার্শ্বদেশে ভিন্ন ভিন্ন নম্বর। দ্বিতীয় পত্রখানি আর ৪, ৫, ৭, ১, ২, ৯, ৩, ৮, ৬, এই নম্বর ধরিয়া পাঠ করিতে পারা গেল না।

তখন অনন্যোপায় হইয়া আমি বর্ডারের নম্বরগুলি প্রত্যেক বর্ণের পাশে সাজানর কোন প্রকার সূত্র বা নিয়ম আছে কি না, তাহাই জানিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম ;—

ক (৪) খ (৫) গ (৭) ঘ (১) ঙ (২) চ (৯) ছ (৩) জ (৮) ঝ (৬)

এইরূপ প্রথায়, প্রত্যেক বর্ণের পার্শ্বে প্রত্যেক নম্বর যেরূপভাবে সাজান হইয়াছে, তাহা হইতেও আমি দেখিতে পাইলাম ৪, ৫, ৭, ১, ২, ৯, ৩, ৮, ৬।

তখন আর আমার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, কিরূপ প্রথায় বর্ডারের বর্ণমালা ও নম্বরগুলি ধরিয়া পত্রের কথাগুলি পড়িতে হয়।

আমি বুঝিলাম, মনোরমা ও নবীন, "হরতনের নওলা" সামনে রাখিয়া পত্রাদি লিখিত। তাসের নয়টি ফোঁটার নয়টি অক্ষর লইয়াই পত্র আরম্ভ হয়। সে নয়টি অক্ষরও আবার এমন উল্‌টা পাল্‌টা ভাবে সাজান থাকে যে, তাহাই বুঝিবার জন্য সঙ্কেতের সৃষ্টি হইয়াছে। সে সঙ্কেতের সৃষ্টি বর্ণমালা ধরিয়া অর্থাৎ 'ক' এর গায়ে যে নম্বরটি থাকিবে উক্ত নয়টি কথার মধ্যে সেই নম্বরের কথাটি হইবে প্রথম। 'খ' এর গায়ে যে নম্বর থাকিবে, সেই নম্বরের কথাটি হইবে দ্বিতীয় ইত্যাদি ইত্যাদি, অর্থাৎ বর্ণমালা ধরিয়া পত্র পাঠ করাই নিয়ম।

যাহা হউক, নয়টি কথা লইয়াই ত প্রায় ঘণ্টা দুই-চার সময় অতিবাহিত করিলাম ; কিন্তু বাকী কথাগুলির উপায় কি ! বিশেষতঃ হীরের বালার কথা ত একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

"হাতে একটিও টাকা নাই। জুয়া খেলায় সব হারিয়াছি। রজনীতে—"

এই কয়টি কথার পর "হীরের বালা" কথাটি দেখিয়াই, আন্দাজে আমি পত্রের ভাব বুঝিতে পারিলাম বটে, কিন্তু মূলপত্রের বাকী কথাগুলি কি প্রকারে পাঠ করিব, তাহাই আবার চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আবার মূলপত্রের আগাগোড়া, এক দুই তিন করিয়া প্রত্যেক কথায় নম্বর দিলাম ; কিন্তু এবার আর মিলিল না।

ডাক্তার অম্বিকাচরণ বাবুর মুখে আমি শুনিয়াছিলাম যে, মনোরমার পিতৃভবনে ৮ই পৌষ তারিখে পূর্ব্বোক্ত ভোজ হয়। সেই তারিখেই মনোরমার পিতা তাহাকে হীরার বালা জোড়াটি পরিতে বলিয়াছিলেন ; কিন্তু মনোরমার নিকটে তখন সে বালা জোড়াটি ছিল না বলিয়া, সে তাহা পরিতে পারে নাই।

পোষ্টাফিসের ছাপ দেখিয়া ধরিলাম যে, নবীন মনোরমাকে ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে পত্র লিখিয়াছিল। সুতরাং ধরিয়া লইলাম যে, ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখ হইতে ৮ই পৌষের মধ্যে মনোরমার হীরের বালা হস্তান্তরিত হইয়াছিল।

মনোরমার পিতা ৯ই পৌষ তারিখে, মনোরমাকে বলিয়াছিলেন—"এই মাস্‌কাবার হ'তে না হ'তেই আমি সেই হীরের বালা জোড়াটি দেখিতে চাই। দেখাইতে পার ভালই, নয় আমায় বলিতে হইবে, তুমি সে বালা কি করেছ বা কাহাকে দিয়াছ। যদি হারাইয়া থাক, খুঁজিয়া দেখ।" এ মাস্‌কাবার কোন্ মাস? নিশ্চয়ই পৌষ মাস।

সেই মাস্‌কাবার হইবার পূর্ব্বেই মনোরমা তাহার পিতাকে হীরের বালা জোড়াটি দেখাইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহার মূল্যবান্ অন্যান্য জড়োয়ার গহনা হস্তান্তরিত হইয়াছিল।

এই সকল বিষয় জানিতাম বলিয়া আমি অনুমানে ধরিয়া লইলাম যে, হয় ত নবীন দেনার দায়ে ও জেলে যাইবার ভয়ে, মনোরমার হীরের বালা চাহিয়া লইয়া বন্ধক দিয়াছিল। তাহার পর পিতার পীড়াপীড়িতে, অন্য অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া হীরের বালা জোড়াটি ফিরাইয়া আনিয়াছিল।

অনুমানে একপ্রকার সিদ্ধান্ত হইল বটে, কিন্তু পত্রের বাকী অংশ-টুকু কেমন করিয়া পাঠ করিব, তাহাই ভাবিয়া পাগল হইলাম। অনেক চেষ্টা করিলাম, তথাপি পাঠ করিতে পারিলাম না। তখন আমার মনে যে আনন্দটুকু হইয়াছিল, তাহাও নিরানন্দে পরিণত হইল। আমি ভাবিলাম, হয় ত প্রকৃত সূত্র আমি এখনও বাহির করিতে পারি নাই।

আবার সেই পত্রখানি লইয়া দেখিতে লাগিলাম। বাকী বাইশটি কথা কিছুতেই সাজাইতে পারিলাম না। প্রথমবারে নয়টি মাত্র কথা, যেমন-তেমন করিয়া হউক, একপ্রকার সাজাইয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু বাইশটি কথা সাজান, বড় দুষ্কর বলিয়া বোধ হইল। যে উপায়ে প্রথম লাইনটি বাহির করিয়াছিলাম, সেই উপায় অবলম্বনে, কোন ফল হয় কি না, দেখিবার জন্য, পত্রের কথাগুলি আলাহিদা কাগজে লিখিলাম।

"নাই—আত্মহত্যা—জোড়াটি—জুয়া—আর—পাখী—কেমন—বেড়ায়— উপায়— সব— হীরের— আছ—হাতে— গুলি— ভাল— একটিও— স্বাধীন— বেশ—রজনীতে—তুমি—কোন—টাকা— উড়িয়া— করিব—পাঠাবে— দেখিনা— নচেৎ— হারিয়াছি— বালা—তারা— খেলায়"

আবার সেইরূপ তাসের দ্বারা রুল কাটিয়া একটি চতুষ্কোণ ঘর করিলাম। তাহার চতুর্দ্দিকে সেইরূপ বর্ডার করিলাম। সেই বর্ডারের ভিতর নম্বর ও বর্ণমালা সাজাইলাম। এবার স্থির করিলাম, মূলপত্রের যে নয়টি কথা, "হরতনের নওলার" নয়টি ছিদ্রদেশ হইতে দেখা গিয়াছিল, নয়টি কথা বাদ দিয়া মিল হয় কি না, দেখিতে হইবে। সেই নয়টি কথা বাদ দিয়া বাকী বাইশটি কথা সাজাইতে এইরূপ দাঁড়াইল;—

চ ৯ ঞ ৮ দ ১৫ শ ১৪ ট ২০ ব ১৩

(১) (২)
আত্মহত্যা জোড়াটি

(৩) (৪) (৫) (৬) (৭)
আর পাখী কেমন বেড়ায় উপায়

(৮) (৯)
হীরের আছ

(১০) (১১) (১২) (১৩)
গুলি ভাল স্বাধীন বেশ

(১৪) (১৫)
তুমি কোন

(১৬) (১৭) (১৮) (১৯) (২০)
উড়িয়া করিব পাঠাবে দেখিনা নচেৎ

(২১) (২২)
বালা তারা

বর্ডারের বর্ণমালা ও নম্বর দেখিয়া পত্রের একটি কথাও পাঠ করা গেল না। বড়ই বিপদে পড়িলাম! এতদূর করিয়া শেষে হাল ছাড়িব? কখনই নয়! কখনই নয়!

তার পর বাইশটি কথার উপরে এক হইতে বাইশ পর্য্যন্ত নম্বর দিলাম। "ক" হইতে "ঝ" পর্য্যন্ত পূর্ব্বলিখিত নয়টি কথায় চুকিয়া

গিয়াছে। বর্ণমালা ধরিয়া মূল পত্রের বাকী বাইশটি কথা একে একে পাঠ করিতে লাগিলাম। বর্ডারে দেখিলাম, "ঞ" এই বর্ণের গায়ে "৮" নম্বর দেওয়া আছে। পত্রে "৮" নম্বরের কথাটি কি, সেইদিকে লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম, "৮" নম্বরের কথাটি "হীরের" আর একখানি কাগজে "হীরের" এই কথাটি লিখিলাম।

তার পর দেখিলাম, "ট" বর্ণের গায়ে, "২১" নম্বর দেওয়া আছে। সুতরাং "২১" নম্বরের কথাটি কি, তাহা খুঁজিয়া "বালা" এই কথাটি পাইলাম। পূর্ব্বে "হীরের" কথাটি পাইয়া একখানি কাগজে তাহা লিখিয়াছিলাম। এবার বালা কথাটিও তাহার নীচে লিখিলাম। দুইটি হইল।

এইরূপে পরে পরে এক-একটি কথা বাহির করিয়া, বাইশটি কথায় যেরূপ দাঁড়াইল, তাহা এই ;—

ঞ (৮) হীরের
ট (২১) বালা
ঠ (২) জোড়াটি
ড (১৮) পাঠাবে
ঢ (২০) নচেৎ
ণ (১) আত্মহত্যা
ত (১৭) করিব
থ (৩) আর
দ (১৫) কোন
ধ (৭) উপায়
ন (১৯) দেখিনা
প (৪) পাখী
ফ (১০) গুলি
ব (১৩) বেশ
ভ (১৬) উড়িয়া
ম (৬) বেড়ায়
য (২২) তারা
র (৫) কেমন
ল (১২) স্বাধীন
শ (১৪) তুমি
ষ (১১) ভাল
স (৯) আছ

দেখিলাম, বর্ণমালার মধ্যে দুইবার "ব" এই বর্ণের ব্যবহার থাকিলেও, নবীন তাহা ব্যবহার করে নাই। তাহাতে গোলযোগ ঘটিতে পারে বলিয়াই বোধ হয় "প" বর্গের তৃতীয় বর্ণ "ব" গ্রহণ করিয়া আর একটি "ব" পরিত্যাগ করিয়াছে।

প্রথমকার নয়টি কথা এবং উপরের বাইশটি কথা, এখন একত্রে সাজাইয়া পূরা পত্রখানি পাঠ করিলাম ;—

"হাতে একটিও টাকা নাই। জুয়া খেলায় সব হারিয়াছি; রজনীতে হীরের বালা জোড়াটি পাঠাইবে। নচেৎ আত্মহত্যা করিব। আর কোন উপায় দেখি না। পাখী গুলি বেশ উড়িয়া বেড়ায়। তারা কেমন স্বাধীন! তুমি ভাল আছ ?"

"পাখীগুলি বেশ উড়িয়া বেড়ায়। তারা কেমন স্বাধীন," এ কথাগুলি লিখিবার কারণ কি ? স্থির করিলাম, আসল কথার মধ্যে এই বাজে কথাগুলি সাজান থাকিলে, আর কেহ সহজে আন্দাজে লাইন সাজাইয়া লইতে পারিবে না বলিয়াই, নবীন এইরূপ করিয়াছে।

একখানি পত্রপাঠে এতটা সময় অতিবাহিত হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার ঘাড় পিঠ টন্ টন্ করিতেছিল, বিশ্রাম গ্রহণের জন্য শয়ন করিবামাত্রই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অম্বিকাচরণ বাবু যখন আমার বাসায় আসিলেন, তখন আমি কাপড় বদ্‌লাইয়া জামা গায়ে দিতেছি।

তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাস বাবু! চিঠী ক'খানার কিছু করিতে পারিয়াছেন কি?"

আমি। একখানি চিঠীতেই, কাল রাত কাবার হইয়াছে। দ্বিতীয়-খানিতে বড় হাত দিতে হয় নাই। সারারাত্রি জাগরণ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই। কারণ, আপনি শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইবেন যে, আমি নবীন ও মনোরমার পত্রাদি লিখন-প্রণালীর সঙ্কেত ও চিহ্ন সমস্তই ঠিক করিতে পারিয়াছি। এখন এ রকম যত চিঠী আছে, নিয়ে আসুন, আমি বিনা ক্লেশে পড়িয়া দিতেছি।

অম্বিকা। তাহা হইলে আপনি হরতনের নওলার গুপ্ত রহস্যও ভেদ করিয়াছেন বলুন।

হরিদাস। হাঁ, মনোরমার টেবিলের ভিতর যে হরতনের নওলা ক'খানি পাওয়া গিয়াছিল, তার গুপ্ত রহস্য ভেদ করিয়াছি বটে; কিন্তু যজ্ঞেশ্বর বাবুর আলষ্টার কোটের পকেটে যে হরতনের নওলা পাওয়া গিয়াছিল, সে বিষয়ে এখনও আমি কিছু স্থির করিতে পারি নাই। আমি বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি।

আমি সারারাত্রি জাগিয়া কি করিয়াছি, অম্বিকাচরণ বাবু দেখিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে দেখাইলাম ও সমস্ত বুঝাইয়া দিলাম।

তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং শত শত বার ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তার পর হঠাৎ কি ভাবিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু একটি কথা আছে। ইহাতে মনোরমার কোন অনিষ্ট হইবে না ত?"

আমি। না হওয়াই সম্ভব, কিন্তু যদি হয়, তাহলেও আমাদের ছাড়া উচিত নয়। যজ্ঞেশ্বর বাবু সকল বিষয়ে নির্দ্দোষী—তাঁহাকে আদালতেও নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করা আবশ্যক হইতেছে।

অম্বিকা। যদি যজ্ঞেশ্বর বাবু নির্দ্দোষ হয়েন, তা'হলে মিস্ মনোরমাও দোষশূন্যা বলিয়া প্রমাণিত হওয়া উচিত।

আমি সম্পূর্ণ সাহসের সহিত উত্তর দিলাম, "তার আর ভুল আছে?"

অম্বিকা। এখন আপনি কি করিবেন?

আমি। করিবার আর বড় কিছু নাই, সবই প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি। এখন নিকলাস সাহেবের বাড়ী যাওয়া যাক্, চলুন। দরজায় আপনার গাড়ী আছে ত?

অম্বিকা। আছে।

আমি। তবে আর কি, চলুন।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, আমরা উভয়েই বহির্দ্বারে গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম এবং যথাসময়ে নিকলাস সাহেবের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদের উভয়ের হর্ষোৎফুল্ল নয়ন, মুখের ভাব-ভঙ্গী ও চাল-চলন দেখিয়াই, হয় ত মনে মনে একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, আমরা যা' হয় একটা হেস্ত-নেস্ত করিয়া ফেলিয়াছি। অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে সেইজন্য তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বোধ হয়, আপনি হরতনের নওলার রহস্য বুঝিতে পারিয়াছেন।"

আমি তখন নিকলাস সাহেবকে আগাগোড়া সমস্ত কথা বলিলাম এবং হরতনের নওলার রহস্য বুঝাইয়া দিলাম।

তিনি যখন সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, তখন অত্যন্ত আহ্লাদিত চিত্তে আমায় বারংবার ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "তবে আর এবার আমার ভাবনা কি? ২৫শে আষাঢ় তারিখে যজ্ঞেশ্বর বাবুর সঙ্গে মনোরমাই যে গোলদীঘীর কাছ থেকে গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন, সে বিষয় প্রমাণ করা কিছু শক্ত হইবে না। অম্বিকা বাবু! আপনি মনে করিবেন না যে, মিস্ মনোরমাকে কোন বিপদে ফেলিব। যজ্ঞেশ্বর বাবু যদি নির্দ্দোষ প্রমাণিত হয়েন, তাহা হইলে মনোরমাও নিরপরাধা বলিয়া প্রমাণিত হইবেন। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে, কেন যজ্ঞেশ্বর বাবু মোকদ্দমায় কোন ব্যারিষ্টারের সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। পাকা ব্যারিষ্টারের জেরায় পাছে মনোরমার নাম প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে অভাগিনী কুমারীর মান বাচাইবার জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করিতে বিন্দুমাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কিন্তু এরূপভাবে অকারণে নির্দ্দোষ ব্যক্তির কোন প্রকার সাজা হওয়া, আমি কখনই দেখিতে পারিব না, আমি নিশ্চয়ই ইহাতে বাধা দিব। মিস্ মনোরমা এখনও রোগ-শয্যায় শায়িতা। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। বাহিরের কোথায় কি হইতেছে, তাহা তিনি কিছুই জানেন না। যজ্ঞেশ্বর বাবু কি ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছেন,-অভাগিনী কুমারী তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহেন। মনে করুন, যজ্ঞেশ্বর বাবুর দ্বিতীয়বার মোকদ্দমা হওয়ার দিন পর্য্যন্ত তিনি এইরূপ অজ্ঞান অচৈতন্য ভাবেই রহিলেন। এদিকে খুনী মোকদ্দমায় স্ত্রীহত্যার অপরাধে বিনাদোষে যজ্ঞেশ্বর বাবুর ফাঁসী হইয়া গেল। বলুন দেখি, যখন মনোরমা আরোগ্য লাভ করিয়া এই সকল কথা শুনিবেন, তখন কি তিনি উন্মাদিনী

হইবেন না? আর কি তাঁহার বাঁচিবার কোন আশা থাকিবে? ডাক্তার বাবু! আপনি কেন চিন্তা কর্‌ছেন? কর্ত্তব্যকর্ম্মে বিমুখ হওয়া কোন ক্রমেই আমাদের উচিত নয়। মিস্ মনোরমাকে যাহাতে আপনি ত্বরায় রোগমুক্ত করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন। যজ্ঞেশ্বর বাবুকে কারামুক্ত করিতে যে যে প্রমাণ আবশ্যক হইবে, এই কয়দিনের মধ্যে সেই সমস্ত যদি আমি সংগ্রহ করিতে না পারি, তাহা হইলে মনোরমাই আমাদের একমাত্র সহায় হইবেন। তিনি এ কথা শুনিলে যজ্ঞেশ্বর বাবুকে রক্ষা করিবার জন্য নিশ্চয়ই স্ব-ইচ্ছায় নিজমুখে সকল কথা স্বীকার করিবেন।"

অম্বিকাচরণ বাবু ক্ষুণ্ণমনে বলিলেন, "কিন্তু মিস্ মনোরমা এখন অত্যন্ত পীড়িতা—আরোগ্য লাভ করা বড়ই দুরূহ——"

নিকলাস। আপনার কি বিশ্বাস, এই পীড়াতেই মনোরমার মৃত্যু হইতে পারে?

অম্বিকা। খুব সম্ভব।

নিকলাস। বোধ হয়, এখন নয়।

অম্বিকা। না।

নিকলাস। আরোগ্য লাভ করিলেও করিতে পারেন?

অম্বিকা। সে আশা অতি সামান্য।

হরিদাস। যদি তাঁহার মৃত্যুর সম্ভাবনাই এত অধিক, তাহা হইলে আপনি বলিতে পারেন, অন্ততঃ পক্ষে মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার একবার জ্ঞান সঞ্চার হইতে পারে কি না?

অম্বিকা। জ্ঞান একবার হইবেই হইবে।

হরিদাস। তাহা হইলে অন্ততঃ সেই সময়েও তাঁহাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া উচিত।

হরিদাস। পঁচিশে আষাঢ় তারিখে রাত্রি সাড়ে দুপুরের সময়ে যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাড়ীতে তিনি যজ্ঞেশ্বর বাবুর সঙ্গে গাড়ী হইতে নামিয়াছিলেন কি না ?

অম্বিকা। সে কথা ত খোদাবক্স কোচম্যানের জবানবন্দীতেই প্রকাশ হইয়াছে। সে ত বলিয়াছে যে, যজ্ঞেশ্বর বাবু সেই রমণীকে লইয়া রাত সাড়ে দুপুরের সময়ে ঠনঠনের হোটেল হইতে বাহির হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

নিকলাস সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "ডাক্তার ! এ নাড়ীটেপা নয়। এতে কিছু ব্যারিষ্টারী বুদ্ধির দরকার করে। খোদাবক্স কোচম্যান বলিলেই ত আর হইল না ; তারও প্রমাণ চাই—সাক্ষী-সাবুদ চাই। নইলে ঐ একটা কথাতেই কত গোলযোগ হইতে পারে। হরিদাস বাবু যাহা ধরিয়াছেন, তাহা ঠিক। আমারও বিশ্বাস এই যে, যে পুরুষ ও স্ত্রী সেই রাত্রে যজ্ঞেশ্বর বাবুর গাড়ীতে চড়িয়া ঠনঠনের হোটেল হইতে যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাড়ীতে আসিয়া নামিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই অন্য স্ত্রী-পুরুষ। যজ্ঞেশ্বর বাবু বা মনোরমা উভয়ের কেহই নয়।"

হরিদাস গোয়েন্দা বলিলেন, "খোদাবক্স কোচম্যানের জবানবন্দীর সেই অংশটুকু স্মরণ করুন। সে বলে যে, যজ্ঞেশ্বর বাবু প্রায় রাত দুপুরের সময় ঠনঠনের হোটেল হইতে বাহির হইয়া আসেন। তখনও তাঁহার সঙ্গে সেই স্ত্রীলোকটি ছিলেন। তিনি বড় ব্যস্ত-সমস্তভাবে গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। ভাবগতিক দেখিয়া কোচম্যানের বোধ হইয়াছিল যে, তাহার প্রভু মদের ঝোঁকে আছেন। তাহার পর গাড়ীতে উঠিয়া যখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'ঘর চল' তখন 'তাঁহার স্বর ভারী—মাতালের মত' বোধ হইয়াছিল ; কিন্তু হরিহর কর্ম্মকারের এজেহারে প্রকাশ যে, যজ্ঞেশ্বর বাবু মাংসাদি আহারীয় ও লেমনেড স্যাম্পেন

প্রভৃতি পানীয় আনিতে হুকুম করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার যৎসামান্য পান ও আহার করিয়াছিলেন। সুতরাং এইখানেই খোদাবক্স কোচম্যানের জবানবন্দী কাটিয়া যাইতেছে। তাহার পর দেখুন, যজ্ঞেশ্বর বাবু যখন তাঁহার কোচম্যানকে জেরা করেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি বলিতেছ যে, যখন আমি এবং সেই রমণী গাড়ীতে উঠি, সেই সময় আমি তোমায় বলিয়াছিলাম, 'ঘর চলো' আমায় কণ্ঠস্বর তখন ভারী ও মাতালের মত—এই রকম তোমার বোধ হইয়াছিল। আচ্ছা, সে কণ্ঠস্বর আমার কি অন্য লোকের তাহা কি তুমি একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছিলে? তোমার কি মনে হয় যে, আমিই 'ঘর চলো' বলিয়াছিলাম?" এই প্রশ্নের উত্তরে খোদাবক্স বলে, "আজ্ঞে হাঁ। আমি একবারের জন্যও ভাবি নাই যে, সে আওয়াজ অপর কারুর।" যজ্ঞেশ্বর বাবুর এইরূপ বিস্ময়কর প্রথার জেরায় আমার মনে হয় যে, ঠন্‌ঠনের হোটেল হইতে বাহির হইয়া তিনি এবং মিস্ মনোরমা কখনই সে গাড়ীতে চড়েন নাই।

অম্বিকা। কিন্তু তাঁহার গায়ে সেই আল্‌ষ্টার কোটটি ত ছিল?

হরিদাস। তারও বিরুদ্ধ প্রমাণ আছে। হরিহর কর্ম্মকারের এজেহারে প্রকাশ যে, যজ্ঞেশ্বর বাবু ঘরের বাহিরে, দেয়ালের গায়ে, তাঁহার আল্‌ষ্টার কোটটি রাখিয়া রমণীর হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করেন। আর একজনের আল্‌ষ্টার কোটও সেইখানে ছিল। সে স্থানে বিশেষ রকম আলোর বন্দোবস্তও ছিল না। যজ্ঞেশ্বর বাবু চলিয়া আসিবার সময় হরিহরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। হরিহর যজ্ঞেশ্বর বাবুকে আল্‌ষ্টার কোট গায়ে দিতেও দেখে নাই।

নিকলাস। ডাক্তার, এখনও তুমি বুঝিতে পারিতেছ না—এখনও তোমার সন্দেহ রহিয়াছে।

অম্বিকা। না, এইবার আমি কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। আমি কেবল এই ভাবিতেছি, হরিদাস গোয়েন্দা এ কাজে হাত না দিলে আমরা কি করিতাম? হয় ত বিনা দোষে যজ্ঞেশ্বর বাবুর ফাঁসীর হুকুম হইয়া যাইত। আমি এখন চলিলাম, তোমরা এখন আইন-কানুন ও প্রমাণ-প্রয়োগাদি লইয়া তর্ক-বিতর্ক কর। তাহার পর যাহা সিদ্ধান্ত হয়, আমি আসিয়া শুনিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ডাক্তার অম্বিকাচরণ চলিয়া গেলে, আমি এবং নিকলাস সাহেব আবার আর একখানি পত্র লইয়া পড়িলাম। পত্রখানি এইরূপ ;—

ম ১৮ ল ১ চ ০ ক ২ ঞ ১৪ থ ১২ ষ ২

টাকা নদীর সুন্দর ঘোড়া

আর উদ্ধার জ্যোৎস্না পারে

অনেক ভাসিতেছে রাখিলে দৌড়ে

হীরের স্রোতে জিতেছি বল বাঁধা

গুলি অলঙ্কার দিলে এবং সমস্ত

হইতে বালা তুমি কিছু কি

টাকা তোমার জোড়াটি জিতের

এই পত্রখানিও পূর্ব্ব পত্রের ন্যায় নবীন মনোরমাকে লিখিতেছে। পত্র পাঠ করিবার উপায় সঙ্কেত ও চিহ্নাদি আমি জানিতাম, নিকলাস সাহেবও বুঝিয়া লইয়াছিলেন। পত্র আরম্ভ করিতে হইলে বর্ডারের ক অক্ষর ও তাহার পরবর্ত্তী নম্বর অনুসারে পড়িতে হয়। সেই সঙ্কেতানুসারে আমি এই পত্রও পাঠ করিতে চেষ্টা করিলাম। এবার ক অক্ষরের নম্বর ৪ নহে ২। সমুদয় বর্ণে এবার অন্য রকম নম্বর পড়িয়াছে। যাহা হউক বুঝিলাম, প্রত্যেকবার ভিন্ন নম্বরে পত্র আরম্ভ হইলেও অক্ষরগুলি পরস্পর ঠিক থাকে—এবারেও 'ক' বর্ণে আরম্ভ। এবার হরতনের নওলার ছিদ্রপথে যে ৯টী অক্ষর পাওয়া গেল, তাহাতে ক হইতে ঝ পর্য্যন্ত এইরূপ নম্বর পড়িল—২, ৪, ৩, ১, ৫, ৯, ৮, ৬, ৭। এই নয়টি শব্দ ঐ নম্বর অনুসারে সাজাইয়া পদ হইল ;—

"ঘোড়া—দৌড়ে—অনেক—টাকা—জিতিয়াছি—জিতের—টাকা—গুলি—সমস্ত———"

তাহার পর এই নয়টি শব্দ বাদ দিয়া বাকী শব্দগুলিতে পূর্ব্ব পত্রের ন্যায় ক্রমান্বয়ে নম্বর দিয়া সর্ব্বশুদ্ধ বাইশটি শব্দ পাইলাম। সেই বাইশটি শব্দ বর্ডারের অক্ষরের নম্বরের সহিত মিলাইয়া পরে পরে সাজাইতে লাগিলাম; এবার ঢ বর্ণে ০। বুঝিলাম, ঢ বর্ণে কোন শব্দ নাই। যাহা হউক, সাজাইতে এইরূপ হইল ;—

"দিলে—এবং—তোমার—আর—কিছু—অলঙ্কার—বাঁধা—রাখিলে—হীরের—বালা—জোড়াটি—উদ্ধার—হইতে—পারে—তুমি—কি—বল—নদীর—স্রোতে—সুন্দর—জ্যোৎস্না—ভাসিতেছে।

সম্পূর্ণ পত্রখানি এইরূপ দাঁড়াইল ;—

"ঘোড়াদৌড়ে অনেক টাকা জিতিয়াছি, জিতের টাকাগুলি সমস্ত দিলেও এবং তোমার আর কিছু অলঙ্কার বাঁধা রাখিলে হীরের বালা জোড়াটি উদ্ধার হইতে পারে। তুমি কি বল? নদীর স্রোতে সুন্দর জ্যোৎস্না ভাসিতেছে।

এই পত্রে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, পিতার পীড়াপীড়িতে মনোরমা হীরার বালা জোড়াটি উদ্ধার করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছিল। অর্থাভাবে নবীন তাহা বন্ধক দিয়াছিল বটে, কিন্তু পাছে সহোদরার কোনরূপ কলঙ্ক রটে, এই ভয়ে তদুদ্ধারে সে-ও বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ নবীন সেই সময়ে ঘোড়-দৌড়ের খেলায় অনেক টাকা জিতিয়াছিল। কিন্তু হীরার বালা জোড়াটি বাঁধা রাখিয়া সে পূর্ব্বে যে টাকা লইয়াছিল, বাজীর জিতের সমস্ত টাকা দিলেও সে ঋণ পরিশোধ হইবে না দেখিয়া, সহোদরার নিকট অন্য অলঙ্কার বাঁধা রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। সহোদরা মনোরমাও যে, সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মনোরমার মাতা ডাক্তার অম্বিকাচরণ বাবুর সম্মুখেই বলিয়াছিলেন, 'সেই মাসকাবার হইবার পূর্ব্বেই মনোরমা তাহার পিতাকে হীরার বালা জোড়াটি দেখাইয়াছিল বটে; কিন্তু আমি জানিতাম যে, তৎপরিবর্ত্তে মনোরমার অন্য জড়োয়ার গহনা হস্তান্তরিত হইয়াছিল।'

নিকলাস সাহেব বলিলেন, "বুঝা গিয়াছে। আপনি আর একখানি পত্র পড়িয়া দেখুন।"

আমি তাঁহার কথামত আর একখানি পত্র পাঠ করিলাম ;—

"জলের বাজী ও আফিংএর চিঠীতে অনেক টাকা লোকসান হইয়াছে। কমলিনীর জন্য আমি বোধ হয়, শীঘ্রই ভয়ানক বিপজ্জালে জড়িত হইব। হয় ত বিনা অপরাধে আমার ফাঁসী বা দ্বীপান্তর হইতে পারে। আমি কোন অপরাধে অপরাধী নই—সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ! তুমি ভিন্ন জগতে আমার আপনার বলিতে কেহ নাই, তাই তোমায় বলিয়া রাখিলাম। যদি আমার বিপক্ষে কোন বিষম মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং আদালতের বিচারে যদি আমি শাস্তিভোগ করি, তাহা হইলে তুমি দুঃখিতা হইও না। কমলিনীকে আমি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। আমি জানি না, সে আমায় কি গুণ করিয়াছে! আমি তাহার জন্য সকল প্রকার শাস্তি অনায়াসে সহ্য করিতে পারিব। আজ রাত্রি নয়টার পর গোলদীঘীতে সেইখানে সাক্ষাৎ হইবে।"

উক্ত পত্র একবারে একখানি হরতনের নওলার ছকে কুলায় নাই। তিনবার করিয়া লিখিতে হইয়াছে। বাজে কথা বাদ দিয়া তাহার সারাংশমাত্র উপরে উদ্ধৃত করা হইল।

পত্রখানি পাঠ করিয়া নিকলাস সাহেব এবং আমি উভয়েই বিস্মিত ও চমকিত হইলাম।

নিকলাস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোন্ কমলিনী ?"

আমি। এ নিশ্চয় সেই হেমাঙ্গিনীর প্রতিবেশী কন্যা; মাতাপিতা অকালে কাল-কবলিত হওয়াতে হেমাঙ্গিনী যাহাকে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন—যে কালসাপিনী যজ্ঞেশ্বর বাবুর মোকদ্দমায় সাক্ষ্য প্রদান করিয়া নিরপরাধ ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে—এ সেই কমলিনী। দেখুন, আমার সম্মুখে যেন অহোরাত্র চারিটি মূর্ত্তি ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। একদিকে দুইজন পুরুষ—তাহার একজন বদ্মায়েস,

নেশাখোর, জুয়াচোর ও পাজী; অপর একজন দধিচীর ন্যায় স্বার্থত্যাগী, বহুগুণসম্পন্ন অমায়িক, শিবতুল্য লোক। অপর দিকে দুইজন স্ত্রীলোক —তাহার একজন কালসাপিনী, সর্ব্বনাশী; অপরজন সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর ন্যায় সতী-সাবিত্রী, ভগ্নহৃদয়ে তনুত্যাগেও কাতরা নয়। এই ভাল দুইজনাকে বাঁচাইতেই হইবে। আমি প্রাণ মন দেহ সমর্পণ করিয়াছি—এবার গোয়েন্দাগিরির চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়া দিব। আপনিও আপনার সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত বিদ্যাবল ও বাগ্মীতা সহায়ে ব্যারিষ্টারীর পরাকাষ্ঠা তেজোময়ী বক্তৃতায় প্রকাশ করিবেন। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পতন, নিশ্চয়ই হইবে।

নিকলাস। ক্রমশঃ আমাদের যেরূপ প্রমাণ সংগ্রহ হইতেছে, তাহাতে যজ্ঞেশ্বর বাবু যদি যথার্থ পক্ষে দোষীও হইতেন, তাহা হইলেও আইনের তর্কে ও যুক্তিবলে তাঁহাকে অনায়াসে উদ্ধার করা সম্ভব হইত। আর দুইদিন যদি আপনি এইরূপ অনবরত পরিশ্রম করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা জয়ী হইব।

আমি। এখন আর ঘরে বসিয়া পরিশ্রম করিবার কিছুই নাই। বাহিরে কাজ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমার প্রথম এবং প্রধান কার্য্য, কমলিনী ও নবীনের বাসস্থান কোথা, অনুসন্ধান করিয়া তাহা বাহির করা। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সন্ধান পাইলে যাহাতে তাহারা এক মুহূর্ত্তও চোখের অন্তরাল হইতে না পারে, তদুপযুক্ত লোকজন নিযুক্ত করা।

নিকলাস। আপনার উপরে আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছি। আপনার গোয়েন্দাগিরি ও তীক্ষ্ণদৃষ্টির প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এ মোকদ্দমায় আপনি যত টাকা ইচ্ছা, অবশ্য খরচ-পত্র করিতে পারেন। টাকার অভাব নাই। এখন বাকী চিঠীখানি পাঠ করুন।

আমি বলিলাম, "হাঁ, ওখানির কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

এই কথা বলিয়াই আর একখানি পত্রের আবরণ উন্মুক্ত করিলাম। সেইখানিই যজ্ঞেশ্বর বাবু কারাগারে নিকলাস সাহেবের হাতে দিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা গেল। পত্রখানি অতি ছোট। তাহাতে এই লেখা ছিল ;—

"মনোরমে !

আমি ভাল আছি, তুমি আমার জন্য চিন্তিত হইও না। আপাততঃ যতদিন পর্য্যন্ত আমার নিকট হইতে পত্রাদি না পাও, ততদিন আমায় চিঠী লিখিও না। কারণ আছে, পরে বলিব।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মিত্র।"

নিকলাস সাহেব বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! যজ্ঞেশ্বর বাবু কারাগারে বসিয়াও এইরূপভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন। এমন দেবচরিত্র, এত স্বার্থত্যাগ, আজকালের কালে ত কোন লোকের দেখা যায় না। যাহাকে ভালবাসেন, তাহার পবিত্র নামে যাহাতে কোন প্রকারে কলঙ্ক না স্পর্শে, তাহার জন্য এরূপ জ্বলন্ত স্বার্থত্যাগের উদাহরণ ত প্রায় দেখা যায় না। ধন্য নিঃস্বার্থ প্রেম! ধন্য ভালবাসা!! একটি মহজ্জীবনের মূল্য কি এতই তুচ্ছ যে, ভালবাসা ও প্রেমের সহিত তুলাদণ্ডে তাহা তিল পরিমাণে পরিগণিত হয়!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তিনদিন ক্রমাগত অনুসন্ধান করিলাম। কলিকাতা তোলপাড় করিয়া ফেলিলাম, তথাপি নবীন ও কমলিনীর কোন সন্ধান করিতে পারিলাম না। যজ্ঞেশ্বর বাবুর মোকদ্দমার পর সে যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। দশজন গোয়েন্দা এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। চতুর্থ দিনে বহু ক্লেশের পর জানিলাম যে, ভবানীপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে মাৎলা রেলওয়ে লাইনে বালিগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি অসচ্চরিত্রা ইংরাজ বারবিলাসিনীর আবাস-মন্দিরের অর্দ্ধাংশ ভাড়া করিয়া নবীন ও কমলিনী নাম ভাঁড়াইয়া বাস করিতেছে।

আমি যথাসময়ে ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত হইলাম। নবীন যে নামে তথায় বাস করিতেছে, সেই নাম ধরিয়া, আমি তাঁহার একজন বিশেষ বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়া তথায় প্রবেশলাভ করিলাম। শুনিলাম, নবীন অত্যন্ত অসুস্থ শরীরে তথায় অবস্থান করিতেছে। আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলাম, কিন্তু যাহার বাড়ী, সে তাহাতে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিল। সে বলিল, "কোন লোকের সহিত তিনি এখন সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং আমি আপনাকে তথায় লইয়া যাইতে পারি না।"

আমি। তিনি কোন্ ঘরে আছেন?

বাড়ীওয়ালী আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া ইঙ্গিতে আমায় নবীনের ঘর দেখাইয়া দিল। আমি আর কোন কথা না কহিয়া তৎক্ষণাৎ সেইদিকে অগ্রসর হইলাম।

বাড়ীওয়ালী কহিল, "আমি আপনাকে নিষেধ করিলাম, তথাপি আপনি জোর করিয়া ও ঘরের দিকে যাইতেছেন, তাহা হইলে আমার কোন দোষ নাই।"

আমি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "তোমার কোন ভয় নাই, উনি আমার পরম বন্ধু, আমাকে দেখিলে রুষ্ট হওয়া দূরে থাক, বরং তুষ্ট হইবেন।"

আমার কথা শুনিয়া সে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি নবীনের কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম।

নবীনকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। তবে ডাক্তার অম্বিকাচরণ বাবু মনোরমার মাতার নিকট হইতে নবীনের একখানি ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেইখানি আমি ভাল করিয়া দেখিয়াছিলাম। তাহাতেই তাহার আকার-প্রকার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল, সেই ধারণা বলেই যতদূর সম্ভব, অনুমান করিয়া লইলাম।

নবীন একখানি পালঙ্কের উপরে শয়ন করিয়াছিল। হঠাৎ আমি গৃহপ্রবিষ্ট হইবামাত্র সে চমকিত হইল, ভয়ে তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। অপরিচিত ব্যক্তিকে বিনানুমতিতে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? কি চাও?"

আমি নবীনের কথায় কোন উত্তর প্রদান না করিয়া ভিতর হইতে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলাম।

নবীন ভীত ও বিস্মিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি? দরজা বন্ধ করিতেছেন কেন?"

আমি। ব্যস্ত কেন, এখনই জানিতে পারিবেন। আমি আপনার সঙ্গে দুই-চার মিনিট কথা কহিতে চাই। আপনাকে কি এখন মিষ্টার রিচার্ড বলেই সম্বোধন করিতে হইবে?

নবীন। আজ্ঞা হাঁ, আমার নামই তাই।

আমি। যদি বন্ধুভাবে আপনার কাছে না আসিতাম, তাহা হইলে ঐ নাম লইয়া ঝগড়া করিবার আমার কারণ ছিল। এখনও যে নামের কথায় আপত্তি উত্থাপন করা অনুচিত, তাহা নয়। আপনার নাম নবীন——

আমার মুখের এই কথা শুনিবামাত্র নবীনের মুখমণ্ডল আরও বিশুষ্ক হইয়া গেল। সে কম্পিতকলেবরে পালঙ্কের উপরে পতিত হইল। রুদ্ধকণ্ঠে, ভগ্নস্বরে নবীন তখন বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কথার মানে কি? আপনি কেন এখানে আসিয়াছেন?"

আমি। তাহা বলিতেছি—তবে ক্রমশঃ। কোন কথা গোপন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই—আপনার সহোদরা——

বাধা দিয়া নবীন বলিল, "আমার সহোদরা! আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমি। আপনি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। আপনার এক যমজ সহোদরা আছেন, তাঁহার নাম মনোরমা। তিনি এখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা—আপনিই তাঁহার এ দুরবস্থা করিয়াছেন—আপনিই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল কারণ——

নবীন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। আমি বুঝিতে পারিলাম, সংসর্গদোষে দুর্ভাগ্য যুবকের এরূপ অধোগতি হইয়াছে; কিন্তু সহোদরার প্রতি তাহার স্নেহ-ভালবাসা এখনও অটুটভাবে রহিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি মনোরমার এ অবস্থার কথা কিছু জানিতেন?"

নবীন। না। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা কি সত্য?

আমি। হাঁ, আমার কথা সত্য। আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা কহিতে আসি নাই। এখন আপনার হাতেই তাঁহার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে—আপনার জন্যই অভাগিনী নিজ জীবনের সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জন দিয়া অপার্থিব স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনার জন্য অভাগিনী কি না করিয়াছেন? এখন তিনি মৃত্যুমুখে পতিতা——

নবীন। বলেন কি? বলেন কি? কি সর্ব্বনাশ!

আমি। আমি কি আপনার সঙ্গে বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছি? হেমাঙ্গিনীর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আপনি যদি নির্দ্দোষ হন, তাহা হইলেই অভাগিনীর জীবন রক্ষা হইতে পারে।

নবীন। আমি নির্দ্দোষী! ভগবান্ জানেন, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ!

আমি। শপথ করিয়া বলিতে পারেন?

নবীন। পারি।

আমি। আপনি নির্দ্দোষ হইয়াও তবে কেন চোরের মত লুকাইয়া রহিয়াছেন? আর আপনার লুকাইয়া থাকার জন্য আর একজন নিরপরাধ ব্যক্তি খুনের দায়ে কারাগারে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, অথচ সে খুন আপনিও করেন নাই, তিনিও করেন নাই। নির্দ্দোষ হইয়াও আপনি অনায়াসে আর একজনের ফাঁসী হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত, এই রকমে লুকাইয়া থাকিতে পারিতেন, আশ্চর্য্য! আপনি আপনার ভগ্নীর বিপদের কথা না জানিতে পারেন, এ কথা আমি বিশ্বাস করিতেও পারি; কিন্তু যজ্ঞেশ্বর বাবুর বিপদের কথা নিশ্চয় আপনি শুনিয়াছেন,

নিশ্চয় আপনি সে কথা জানেন। এ কথা আপনি কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারেন না। মনে রাখিবেন, আর আপনার লুকাইয়া থাকিলে চলিতেছে না—আর আপনি এ সকল কথা অপ্রকাশ রাখিতে পারিতেছেন না।

নবীন। না, যজ্ঞেশ্বর বাবুর বিপদের কথা আমি শুনি নাই বা জানি না, এ কথা বলিতে পারি না—এ কথা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। আমি তাঁহার মোকদ্দমার কথা জানি।

আমি ঘৃণার সহিত বলিলাম, "তবে আপনি সাহসী যুবার ন্যায় সত্যপরায়ণতা দেখাইতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন কেন? কেন আপনি মোকদ্দমার দিনে নিজে স্ব-ইচ্ছায় আদালতে উপস্থিত হইয়া এ কথা বলেন নাই যে, পঁচিশে আষাঢ় তারিখের রজনীতে, যজ্ঞেশ্বর বাবু এবং আপনার ভগ্নী ঠন্ঠনের হোটেলে যে কক্ষে বসিয়াছিলেন, তাহার পাশের ঘরে সাহেববিবি সাজে আপনি এবং কমলিনী উপবিষ্ট ছিলেন? কেন স্বীকার করেন নাই যে, পাপিনীর পাপ-মন্ত্রণায় আপনি যজ্ঞেশ্বর বাবুর আল্‌ষ্টার কোটটি চুরি করিয়া যে গাড়ীতে আপনার ভগ্নী যজ্ঞেশ্বর বাবুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন, সেই গাড়ীতে আপনার প্রণয়িনীর সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিলেন? আমার কথার উত্তর দিন, কেন আপনি জানিয়া-শুনিয়া একজন নিরপরাধ ব্যক্তির ফাঁসী দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন? যজ্ঞেশ্বর বাবু খুন করেন নাই, জানিয়াও কেমন করিয়া আপনি নীরব হইয়া আছেন?"

নবীন চীৎকার করিয়া বলিল, "সে খুন নয়! খুন নয়! হেমাঙ্গিনী নিজের হাতে নিজের জীবন নাশ করিয়াছে, সে আত্মহত্যা করিয়াছে!"

সহসা এই কথা শুনিয়া আমার চমক ভাঙ্গিল। এতক্ষণে যে ঘটনা আমি খুন বলিয়া মনে করিতেছিলাম, এখন আমার ধারণা হইল যে,

তাহা খুন নহে—আত্মহত্যা! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হেমাঙ্গিনী নিজহস্তে নিজের প্রাণনাশ করিয়াছেন? হেমাঙ্গিনী আত্মহত্যা করিয়াছেন?"

নবীন। হাঁ, আত্মহত্যা করিয়াছেন। বিছানার পাশে টিপায়ের উপরে তাঁহার স্ব-হস্তলিখিত একখানি পত্রে তাহার প্রমাণ ছিল।

আমি। সেটি আপনি সরাইয়াছিলেন—কেমন?

নবীন। না—না—আমি নয়—আমি নয়—সেখানি কমলিনী লইয়াছিল।

সত্যকথা বলিতে কি এই কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বশরীর শিহরিত হইল, অন্তর আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ আমি আর একটিও কথা কহিতে পারিলাম না। ক্ষণকাল নতমুখে চিন্তার পর আমি নবীনের দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "আপনার যেন মনে থাকে যে, আপনি এমন একজন লোকের সম্মুখে কথা কহিতেছেন, যে, নির্দ্দোষ ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্য প্রাণ, মন, দেহ উৎসর্গ করিয়াছে। স্মরণ রাখিবেন, আপনার সঙ্গে যে কথা কহিতেছে, সে "ধর্ম্মের জয়—অধর্ম্মের ক্ষয়" রাজদ্বারে প্রকৃত প্রমাণ প্রয়োগে সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। নিশ্চয় জানিবেন, আপনার ভাগ্যের ফলাফল এখন আমার উপরে নির্ভর করিতেছে। আমি আপনার সর্ব্বনাশ করিতে পারি। যদি আপনি আমার সহিত বিন্দুমাত্র চাতুরী খেলিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আপনার সেই সামান্য প্রবঞ্চনার জন্যও আপনার সর্ব্বনাশ হইতে পারে। আপনার জীবনস্রোতের এই এক ভয়ানক আবর্ত্তন! এই তরঙ্গায়িত স্রোতে আপনার জীবনের গতি ফিরিবে। আপনার সত্যপরায়ণতার উপরে আপনার অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে। প্রাণ মন খুলিয়া আমার কাছে সমস্ত সত্যকথা বলুন—কোন কথা গোপন

করিবেন না। আপনার উৎসন্নে যাইবার সূত্রপাতের দিবস হইতে আজ পর্য্যন্ত আপনার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা আমি শুনিতে চাই।"

বিদগ্ধ-হৃদয় নবীন তখন আত্মজীবনী বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। আমি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে তাহাকে প্রবোধবাক্যে উৎসাহিত করিতেও হইল। নবীনের সে নিরাশাপূর্ণ ভগ্নহৃদয়ের কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমার বড় দুঃখ হইল।

কলিকাতার হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ হইয়া নবীন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হয়। যজ্ঞেশ্বর বাবুর পিতার সহিত শিবপুরে তাহার আলাপ হয়। যদিও তিনি নবীন অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ, তথাপি নবীনের সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য জন্মে। যজ্ঞেশ্বর বাবুর পিতার অনেক দোষ ছিল। তিনি অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়া অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। এমন কোন প্রকার জুয়াখেলা নাই যে, যজ্ঞেশ্বর বাবুর পিতা তাহাতে অপরিপক্ক ছিলেন। এই সকল কারণে উদারহৃদয় যজ্ঞেশ্বর বাবু পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পিতার সহিত যজ্ঞেশ্বর বাবুর সাংসারিক কোন সম্পর্কই ছিল না। যজ্ঞেশ্বর বাবু স্বকৃত উপার্জ্জনে কলিকাতায় বাটী নির্ম্মাণ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতেছিলেন।

যজ্ঞেশ্বর বাবুর পিতারও কলিকাতায় পাঁচ-সাতখানি বাড়ী ছিল, কিন্তু তিনি কলিকাতায় থাকিতেন না। তাঁহার বাড়ীতে প্রতিদিনই প্রেমারা খেলার আড্ডা বসিত। কলিকাতায় দুই-তিনবার ধরা পড়িয়া তাঁহার জরিমানা হয়। সেইজন্য তিনি কলিকাতার বসত-বাটী পর্য্যন্ত ভাড়া দিয়া শিবপুরে তাঁহার বাগান-বাটীতে বাস করিতেছিলেন। অনেক ধনি-সন্তান নানাবিধ জুয়াখেলা খেলিতে এই শিবপুরের বাগানে

উপস্থিত হইতেন। যজ্ঞেশ্বর বাবুর পিতা জুয়াখেলায় সর্ব্বনাশসাধন করিবার জন্য ধনি-সন্তানগণকে যোগাড় করিতেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারই কুহকে পড়িয়া নবীনের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল।

যজ্ঞেশ্বর বাবুর পিতা এখন পরলোক গমন করিয়াছেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা করা অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করি। তবে এই ঘটনা সপ্রমাণ করিবার জন্য যে সকল বিষয় অত্যাবশ্যক, তাহাই অতি সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

যজ্ঞেশ্বর বাবুর পিতা নবীনকে অংশীদার স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ব্যবসা করেন। সাংসারিক জ্ঞানহীন অপরিণত বয়স্ক যুবা নবীন, তাঁহার বিষম চাতুরী অনুধাবন করিতে না পারিয়া বার বার প্রবঞ্চিত হয়।

যজ্ঞেশ্বর বাবু প্রথমে এ সকল কিছুই জানিতেন না। পিতার সহিত স্বতন্ত্রভাবে থাকিলেও পুত্রের কর্ত্তব্য কার্য্যে তিনি কখনই অবহেলা করেন নাই। প্রায়ই তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং কোন বৈষয়িক কার্য্যে বিশেষ পরামর্শের আবশ্যক হইলে তিনি সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন।

যজ্ঞেশ্বর বাবু স্বতন্ত্রভাবে থাকিতেন বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহার উপরে অসন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার পুত্র তাঁহার কার্য্যকলাপে তাঁহার উপর ঘৃণা প্রকাশ করিবেন। তদপেক্ষা স্বতন্ত্রভাবে থাকাতে আপত্তি কি? বিশেষতঃ যজ্ঞেশ্বর বাবুর স্বতন্ত্রভাবে থাকিবার ব্যয়ভার তাঁহাকে বহন করিতে হয় নাই বলিয়া তিনি এরূপ স্বতন্ত্রতার অপক্ষপাতী হয়েন নাই।

মিস্ মনোরমার মুখ চাহিয়া তাঁহার সহোদর নবীনকে অধঃপাতের পথ হইতে ফিরাইবার জন্য যজ্ঞেশ্বর বাবু অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

যজ্ঞেশ্বর বাবুর পিতা এবং নবীন উভয়েই ঘোড়দৌড়ের বাজী খেলিতেন। উভয়েই তাহাতে বহু সহস্র মুদ্রা হারিয়াছিলেন।

হেমাঙ্গিনীর পিতা বাজী গ্রহণ করিতেন ; তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। নবীন এবং যজ্ঞেশ্বর বাবুর পিতা তাঁহারই নিকটে বাজী রাখিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটে ইঁহাদের অপর্য্যাপ্ত ঋণও হইয়া পড়িয়াছিল। সে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য হেমাঙ্গিনীর পিতা বিশেষ পীড়াপীড়ি করাতে নবীন ও যজ্ঞেশ্বর বাবুর পিতা উভয়ে উভয়ের সমস্ত ঋণ স্বীকার করিয়া হেণ্ডনোট লিখিয়া দেন।

ঋণ যতই বাড়িতে লাগিল, যজ্ঞেশ্বর বাবুর পিতা ও নবীনের অর্থোপার্জ্জনের লালসা ততই প্রবল হইতে লাগিল। ততই তাঁহারা অধিকতর চাতুরী-জালপূর্ণ জুয়াখেলায় মন দিতে লাগিলেন। শেষে তাহাতেও সাম্‌লাইতে না পারিয়া জাল জুয়াচুরি আরম্ভ করিলেন। সেই সকল জালজালিয়াতীপূর্ণ কাগজ-পত্র হেমাঙ্গিনীর পিতার হস্তগত হওয়াতেই বিষবৃক্ষ রোপিত হইল। সেইখান হইতেই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল।

এই ঘটনাটির মীমাংসার জন্য দায়ে পড়িয়া যজ্ঞেশ্বর বাবুকে হেমাঙ্গিনীর পিতার নিকটে যাইতে হয়। মিস্ মনোরমা যজ্ঞেশ্বর বাবুকে পত্রের দ্বারা জ্ঞাত করেন যে, তাঁহার ভ্রাতা নবীন বড় বিপদে পড়িয়াছে এবং বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া অনুরোধও করেন যে, নবীনকে যে কোন প্রকারে হউক, উদ্ধার করিতেই হইবে। কেন না, হেমাঙ্গিনীর পিতা নবীনের নামে নালিশ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন। যজ্ঞেশ্বর বাবুর পিতার সহিত নবীনের কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহা বোধ হয়, মিস্ মনোরমা সে সময়ে জানিতেন না।

হেমাঙ্গিনী, যজ্ঞেশ্বর বাবুকে দেখিয়া তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হয়েন। তাঁহার পিতা যে প্রকার ধরণের লোকই হউক না কেন, তিনি একমাত্র

কন্যা হেমাঙ্গিনীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং কেবল তাহার কথায় যজ্ঞেশ্বর বাবুর পিতা ও নবীনকে বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয় নাই। যজ্ঞেশ্বর বাবুকে তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি সেই সকল কাগজ-পত্র ও হেণ্ড-নোট আপনাকে ফিরাইয়া দিতে পারি—নচেৎ নয়।"

এইরূপ ভয়ানক অবস্থায় পড়িয়া মনোরমার একান্ত অনুরোধে মনোরমাকে বিবাহ করিবার আশা যজ্ঞেশ্বর বাবুকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি জানিতেন, হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করিলে আর তিনি মনোরমাকে পাইবেন না। এদিকে নবীনকে বাঁচাইতে না পারিলে মনোরমাও বাঁচিবেন না। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া নিজ জন্মদাতাকে রক্ষা করিবার জন্য ও মনোরমার ভ্রাতাকে উদ্ধার করিবার আশায় তিনি বাধ্য হইয়া নিজ জীবনের সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন —যাহাকে এক তিল ভালবাসিতেন না, তাহারই পাণিগ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন।

ভালবাসা, মান সম্ভ্রম ও জীবনের সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জন দিয়া খড়্গাগ্রে আপন জীবন উৎসর্গ করিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবু নিঃস্বার্থ পরোপকার ও আশ্চর্য্য উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাঁহাদিগের রক্ষার জন্য তিনি হেমাঙ্গিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশের মূল সূত্রস্বরূপ সেই সকল কাগজ-পত্র তিনি সমস্তই ফিরাইয়া পাইবেন, এই কথাই হইয়াছিল। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর পিতা যজ্ঞেশ্বর বাবুকে সেই সকল কাগজ-পত্র ফিরাইয়া দিবার সময় তিনখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু বিবাহের কিছুদিন পরে সে কথা জানিতে পারিয়াছিলেন।

যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাড়ীতেই কমলিনীর সহিত নবীনের আলাপ-পরিচয়

হয়। মায়াবিনী কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক দুর্ভাগা নবীনকে মোহিত করিয়াছিল। এমন কি তাহার হাত হইতে নবীনের উদ্ধারের আর কোন উপায় ছিল না। সে সকল চক্রান্তের কথা এখানে বর্ণন করিবার কোন আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলাম। কমলিনী নবীনকে এমন মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল যে, সে তাহাকে যে দিকে ফিরাইত, নবীন সেইদিকে ফিরিত; যে কথা বলিত, সে তাহাই শুনিত। কিন্তু এতদূর মুগ্ধ হইয়াও নবীনের নিজ বংশমর্য্যাদা ও পৈত্রিক মান-সম্ভ্রম কখন কখন স্মরণ হইত।

কমলিনী, নবীনের কাছে নিজ বিবাহের প্রস্তাব করিলে নবীন বলিয়াছিল, 'হেমাঙ্গিনীর পিতা যে তিনখানি কাগজ যজ্ঞেশ্বর বাবুকে ফিরাইয়া দেন নাই, সেই তিনখানি কাগজ কোন উপায়ে কৌশলক্রমে যদি তুমি আমার হাতে দিতে পার, তবে আমি তোমায় বিবাহ করিতে পারি।'

কমলিনী জিজ্ঞাসা করে, 'সে তিনখানি কাগজ কাহার কাছে আছে?'

নবীন তাহাতে উত্তর করে, 'হেমাঙ্গিনীর কাছে।'

নবীনকে বিবাহ করিবার জন্য কমলিনী উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল বটে কিন্তু হেমাঙ্গিনীর হাত হইতে সে তিনখানি কাগজ বাহির করা বড় শক্ত কাজ! যজ্ঞেশ্বর বাবু হেমাঙ্গিনীকে ভালবাসিতেন না বলিয়া সেই তিনখানি কাগজ হেমাঙ্গিনী বড় যত্নের সহিত রাখিয়াছিল এবং ভয় দেখাইবার প্রয়োজন হইলেই স্বামীর কাছে হেমাঙ্গিনী সেই কাগজ-পত্রের উল্লেখ করিত। কাজেকাজেই অতি মূল্যবান্ হীরা-জহরতের গহনা অপেক্ষা, হেমাঙ্গিনীর নিকট সেই কাগজ কয়খানির অধিক আদর ছিল।

ঠন্‌ঠনিয়ার হোটেলে পঁচিশে আষাঢ় তারিখে রজনীতে কমলিনী, নবীনের সহিত সংগোপনে প্রেমালাপনের জন্য গিয়াছিল। যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাড়ী হইতে রজনীযোগে কমলিনী এরূপভাবে প্রায়ই বাহির হইত। নবীনকে না দেখিলে সে থাকিতে পারিত না। সে রজনীতেও তাহাই ঘটিয়াছিল। ঘটনাক্রমে যজ্ঞেশ্বর বাবুও মিস্ মনোরমাকে লইয়া সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হন। কমলিনী যজ্ঞেশ্বর বাবুকে আল্‌ষ্টার কোট খুলিয়া দেয়ালের গায়ে রাখিয়া গৃহপ্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল। পাপিনীর মনে পাপ-চিন্তা সদাই প্রবলা! যজ্ঞেশ্বর বাবুর উপস্থিতিতে তাহার মনে পাপ চিন্তার উদয় হইল। সে নবীনকে বলিল, "দেখ, এ এক উত্তম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যে গাড়ীতে যজ্ঞেশ্বর বাবু ও মিস্ মনোরমা আসিয়াছেন, চল সেই গাড়ী করিয়া আমরা প্রস্থান করি। তুমি যেখানে তোমার আল্‌ষ্টার কোটটি রাখিয়াছ, যজ্ঞেশ্বর বাবুও সেইখানে তাঁহার কোটটি রাখিয়া ঘরে ঢুকিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি। যজ্ঞেশ্বর বাবুর আল্‌ষ্টার কোটটির মত কোট প্রায় দেখা যায় না। ঐটি গায়ে দিয়া যদি তুমি বেরিয়ে পড়্‌তে পার, তাহা হইলেই তোমাকে গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া কোচ্‌ম্যান অত সন্দেহ করিতে পারিবে না। আমিও তোমার পিছনে পিছনে গিয়া গাড়ীতে ঠিক উঠিয়া বসিব। আমরা যদি তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ীতে উঠি, তাহা হইলে কোচ্‌ম্যান অত নজর করিয়া দেখিবে না। বিশেষতঃ এখন বড় বৃষ্টি হইতেছে। জলের ছাটে ঘোড়া দুইটি পাছে ক্ষেপিয়া উঠে, এই জন্য খোদাবক্সকে সেইদিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছে। আমরা গিয়া যদি তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়া বলি, "ঘর চল," তাহা হইলেও সে-ও আল্লার নাম করিয়া দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করে।"

নবীন জিজ্ঞাসা করে, "কেন এ রকম করিয়া কি হইবে? যজ্ঞেশ্বর

বাবু যদি কখন জানিতে পারেন, তাঁহা হইলে তিনি কি মনে করিবেন? আমার ভগ্নীই বা কি মনে করিবে?”

কমলিনী। তোমার মাথায় এ সব বুদ্ধি আসিবে কেন? কেন আমি তোমায় এ কাজ করিতে বলিয়াছি, তাহাই যদি তুমি বুঝিতে পারিবে, তাহা হইলে তোমার এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন, বল। দেখিতেছ, এখন যজ্ঞেশ্বর বাবু বাড়ী-ছাড়া—হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে যে রকম ঝগড়া হইয়াছে, তাহাতে আজ বাড়ী ফিরিয়া যান কি না সন্দেহ। এ অবস্থায় যদি আমরা যজ্ঞেশ্বর বাবুর গাড়ী চড়িয়া তাঁহার বাড়ীতে ঢুকিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না। হেমাঙ্গিনী এতক্ষণ অঘোর ঘুমে অচেতন! যদি সেই জালীয়াতী পূর্ণ কাগজ তিনখানি এই সুযোগে হস্তগত করিতে পার, তাহা হইলে তোমার ভাল হয়—না মন্দ হয়?

নবীন এতক্ষণে কমলিনীর কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল। অন্য সকল কথা ভুলিয়া গিয়া তখন তাহার সেই চিন্তাই প্রবল হইল। যে কাগজ তিনখানি পাইবার জন্য পূর্ব্বে সে অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছে, আজ যদি তাহা অনায়াসলভ্য হয়, তবে কেন সে সুযোগ পরিত্যাগ করিবে। “লোভেই পাপ! পাপেই মৃত্যু!” নবীন কমলিনীর কথায় মরিল। যজ্ঞেশ্বর বাবুর আলষ্টার কোটটি চুরি করিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবু ও মিস্ মনোরমা যে গাড়ীতে আসিয়াছিলেন, সেই গাড়ীতে চড়িয়া প্রস্থান করিতে সম্মত হইল।

কমলিনী জানিত যে, হেমাঙ্গিনী সেই তিনখানি কাগজ যজ্ঞেশ্বর বাবুকে ভয় দেখাইবার ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞানে সর্ব্বদাই অতি সাবধানে ও সযতনে রক্ষা করিতেন। এমন কি নিদ্রিতাবস্থায়ও নিজের মাথার বালিশের নীচে তাহা লুকাইয়া রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন।

নবীন যে অবধি কমলিনীকে বলিয়াছিল, "হেমাঙ্গিনীর পিতা যে তিনখানি কাগজ যজ্ঞেশ্বর বাবুকে ফিরাইয়া দেন নাই, সেই তিনখানি কাগজ কোন উপায়ে কৌশলক্রমে যদি তুমি আমার হাতে দিতে পার, তবে আমি তোমায় বিবাহ করিতে পারি।" সেই পর্য্যন্ত কমলিনী তাহা হস্তগত করিবার কত চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই—অথচ নবীনকে পাইবার আশা পরিত্যাগ করাও তাহার পক্ষে সহজ নয়। কাজেকাজেই এই পাপচিন্তা তাহার মনে উদয় হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? কমলিনী নবীনকে বলিল, "এমন সুযোগ আর মিলিবে না। হেমাঙ্গিনী এখন নিদ্রিতা। এই নিদ্রিতাবস্থাতেই তাঁহার বালিশের তলদেশ হইতে আমি সেই কাগজ কয়খানি চুরি করিব। যদি তিনি জাগিয়া উঠিয়া আমাদের কার্য্যে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ বলপ্রয়োগ করিতে পারিবে। যজ্ঞেশ্বর বাবু বাড়ীতে নাই, সুতরাং বাধা দিবার অন্য লোকও দেখি না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যজ্ঞেশ্বর বাবু সম্বন্ধে এই স্থলে দুই-একটি কথা বলা উচিত। পঁচিশে আষাঢ় তারিখে সকালে তিনি মিস্ মনোরমার নিকট হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল ;—

"প্রিয়তম যজ্ঞেশ্বর বাবু !

দাদার জন্য আমি বড় ভাবিত হইয়াছি। তিনি ঘোড়দৌড়ের বাজীতে, জলের খেলায়, আফিংএর চিঠী ও কোম্পানীর কাগজ কেনা-বেচায় এত অধিক লোকসান দিয়াছেন যে, আর তাঁহার উদ্ধারের কোন উপায় নাই। আপনি জীবনের সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র আমায় সুখী করিবার জন্য নীচ লোকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া একবার দাদাকে বাঁচাইয়াছেন, কিন্তু এবার তিনি লোকলজ্জাভয়ে ও মান-সম্ভ্রমের দায়ে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবেন। আমরা উভয়ে পরস্পর কিরূপ স্নেহ-পরবশ তাহা আপনাকে বুঝাইয়া বলা বাহুল্য মাত্র। বহু-বার বহু বিষয়ে আপনি দেখিয়াছেন, আমি দাদার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কাতর নহি। আর একবার আপনি তাঁহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করুন; অধিনীর এই শেষ অনুরোধ ভুলিবেন না। তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন, সত্বর এ সংবাদ না পাইলে আমার জীবনধারণ করা ভার হইবে। আমি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। আজ রাত্রি দশটার পর গোলদীঘীতে সেই স্থানে আমার সাক্ষাৎ পাই-বেন। দাদার সংবাদ পাইবার জন্য আমি তথায় আপনার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিব। কত টাকা পাইলে এবার তাহার ঋণ পরিশোধ হয়, জিজ্ঞাসা করিবেন। তিনি বড় অভিমানী—তাঁহাকে কোন প্রকার

তিরস্কার করিবেন না। দুই-একবার বুঝাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু কড়া কথা একটিও বলিবেন না। জিজ্ঞাসা করিবেন, কেন তিনি বার বার এরূপ করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া আমায় কষ্ট দিতেছেন? না—না—তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ নাই। তিনি হয় ত মনে করিতে পারেন, আমার অলঙ্কার প্রভৃতি বন্ধক পড়াতে আমি স্বার্থের বশে এই কথা আপনাকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। কাজ নাই, তাহাকে কোন কথা বলিয়া কাজ নাই। আপনি কেবল সন্ধান করুন, তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কি করিতেছেন? মনের কথা আপনাকে আর অধিক কি বলিব? আমার মনোবেদনা আপনার নিকট কিছুই অবিদিত নয়। পরজন্মে যেন আপনাকে স্বামীরূপে প্রাপ্ত হই। আপনি দেবতা—অধিনী মানবী। আপনি দধিচীর ন্যায় পুণ্যবান্। আপনার স্বার্থত্যাগ, উদারতা, মহানুভবতা জগতের আদর্শস্থল। যদি পৃথিবীতে আপনার ন্যায় মনুষ্য এক চতুর্থাংশ থাকিত, তাহা হইলে এই পৃথিবীই কি স্বর্গে পরিণত হইত না? আপনার সম্মুখে আপনার প্রশংসা করা এ অধিনীর উদ্দেশ্য নয়। মনের আবেগে যে কয়ছত্র লিখিলাম, তাহা অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়াছে, জানিবেন।

ভগ্নহৃদয়া বিনীত-নিবেদিকা,

শ্রীমতী মনোরমা।”

উপরোক্ত পত্রখানিই পঁচিশে আষাঢ় তারিখে প্রাতঃকালে যজ্ঞেশ্বর বাবু নিজ কক্ষে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছিলেন। কমলিনীর এজেহারে এ কথা প্রকাশ হইয়াছে। তার পর সেইদিনেই যজ্ঞেশ্বর বাবুর সহিত হেমাঙ্গিনীর বিষম কলহ উপস্থিত হওয়াতে তিনি মনের দুঃখে, ঘৃণায় ও অভিমানে বাড়ী হইতে চলিয়া যান।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়াও তিনি মনোরমার পত্রের কথা বিস্মৃত

হইতে পারেন নাই। বেলা এগারটা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত তিনি কত জায়গায় কত লোকের নিকট নবীনের সন্ধান করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। তাহার পর রাত্রি দশটার সময় কেমন করিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবুর সহিত মিস্ মনোরমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও তাহার পর কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন।

কমলিনী ও নবীন যে প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ সফল হইয়াছিল। তাহারা উভয়ে যজ্ঞেশ্বর বাবুর গাড়ীতে চড়িয়া তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করা পর্য্যন্ত, কেহ তাহাদিগকে সন্দেহ করে নাই।

মনোরমা ও নবীন হরতনের নওলায় পত্রাদি লেখালেখি করিত। কমলিনীর সহিত ঠন্ঠনিয়ার হোটেল হইতে বাটী ফিরিয়া যাইবার সময় নবীন আপনার পকেট হইতে একখানি হরতনের নওলা বাহির করিয়া ভ্রমক্রমে তাহা যজ্ঞেশ্বর বাবুর আল্‌ষ্টার কোটের পকেটে রাখিয়াছিল।

নবীন ও কমলিনী যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, মনের দুঃখে, রাগে, ঘৃণায় ও অভিমানে হেমাঙ্গিনী শিরঃপীড়ার সেই বিষাক্ত ঔষধ এক শিশি খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। নিজ শয্যা-পার্শ্বদেশে টিপায়ের উপর স্বহস্তলিখিত একখানি পত্রে তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ;—

"মনের দারুণ ঘৃণায় আমি বিষপানে আত্মহত্যা করিলাম। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আমি জীবিত থাকিতে আমার স্বামী কখন সুখী হইতে পারিবেন না। ক্রোধের বশে তাঁহাকে সময়ে সময়ে অনেক অকথা-কুকথা বলিয়াছি, তিনি যেন ক্ষমা করেন। তাঁহার সুখের জন্য আমি প্রাণত্যাগ করিলাম। জীবনদানেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না কি ?

অভাগিনী হেমাঙ্গিনী।"

হেমাঙ্গিনী বিষাক্ত ঔষধ সেবন করিয়া যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে, সম্ভবতঃ সেই সময় উপরোক্ত পত্রখানি লিখিয়া আত্মহত্যা স্বীকার করে।

কমলিনী সেই পত্রখানি হস্তগত করে। নবীন সে কথা সাধারণে প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই। কারণ, কমলিনী তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, সে কথা প্রকাশ করিলে তাহাদের উভয়েরই ফাঁসী হইবে। দুর্ব্বলহৃদয় নবীন তাহাই তাহা প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই। যে তিনখানি কাগজ্ হস্তগত করিবার অভিলাষে কমলিনী ও নবীন ষড়যন্ত্র করিয়া ঠন্‌ঠনিয়ার হোটেল হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহাও হস্তগত করিতে কমলিনী বিস্মৃত হয় নাই।

নবীনের নিকট এই সকল কথা শুনিয়া আমি দুই-একটি বিষয়ে সন্দেহ-বিমোচনের প্রশ্ন করিব, মনে করিতেছি, এমন সময়ে বহির্দ্দেশ হইতে কক্ষদ্বারে কে মৃদুভাবে আঘাত করিতে লাগিল।

নবীন ভয়াকুলচিত্তে বলিল, "ওই কমলিনী আসিয়াছে!"

আমি বলিলাম, "বলেন কি? তবে ত ভালই হইয়াছে। এই আল্মারীর পাশে আমি লুকাই—আপনি দরজা খুলিয়া দিন।"

এই বলিয়া আমি আল্মারীর পশ্চাতে লুক্কায়িত হইলাম। নবীন দরজা খুলিয়া দিল। বিবিয়ানা-বেশধারিণী কমলিনী গৃহপ্রবিষ্টা হইল।

কমলিনী নবীনকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল, নবীন একটি কথারও উত্তর দিতে পারিল না। রাগিয়া চোখ-মুখ লাল করিয়া কমলিনী নবীনের নিকটে আসিয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বোবা হইয়া গিয়াছ না কি? কথার জবাব দিচ্ছ না যে?"

চীৎকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নবীন বলিল, "কালসাপিনী! তুই আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লি! কেন তুই এ কাজে আমাকে জড়িয়েছিলি?



"আমি কি চাই, মন দিয়া শুন।"

[হরতনের নওলা—১৭১ পৃষ্ঠা।

Lakshmibilas Press.

কেন আমায় খুন করিলি নি ? কেন আমায় বিষ খাওয়াইলি নি ? তোর পাপে আমার সহোদরা মরিতে বসিয়াছে—তুই আমার সম্মুখ হইতে এখনই দূর হইয়া যা।”

আমি আর লুকাইয়া থাকিতে পারিলাম না ; আল্মারীর পার্শ্বদেশ হইতে আমি বাহির হইয়া পড়িবামাত্র চমকিত হইয়া কমলিনী জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি—কে তুমি ? এখানে কেন ? কি চাও ?”

মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া আমি কমলিনীর পোষাকের এক অংশ চাপিয়া ধরিলাম, এবং বংশীবাদন করিলাম। তৎক্ষণাৎ পুলিসের পরিচ্ছদ পরিধৃত আমার দুইজন অনুচর সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

কমলিনীর তখনকার ভয়বিহ্বল ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমি মৃদুহাসি হাসিয়া কহিলাম, “আমি কে, তাহা তুমি সহজেই অনুমান করিতে পার। আমি এখানে যে জন্য আসিয়াছি, তাহাতে তোমার ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। আমি কি চাই, মন দিয়া শুন।”

হস্তেঙ্গিতের দ্বারা নবীনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি বলিলাম, “এই ভদ্রলোক আমার নিকট যে সকল কথা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া যদি আমি আদালতে দাখিল করিতে পারি, তাহা হইলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।”

বাত্যাবিতাড়িত বেতসীলতার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে কমলিনী সেইখানে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। ছাড়া-ছাড়া কথায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল, “আমার সর্ব্বনাশ! কেন ? আমি কি করিয়াছি ?”

আমি দেখিলাম, ঔষধ ধরিয়াছে। কমলিনীকে চিন্তা করিবার সময় না দিয়াই আমি বলিলাম, “কি করিয়াছ, তাহা কি তুমি জান না ? ষড়যন্ত্র করিয়া দুইজনে ঠন্‌ঠনের হোটেল হইতে যজ্ঞেশ্বর বাবুর

কোটটি চুরি করিয়া, তাঁহার গাড়ীতে তাঁহারই বাড়ীতে গিয়া কি করিয়াছিলে, তাহা কি এখন মনে পড়িতেছে না? হেমাঙ্গিনীর মৃত্যুর পূর্ব্বে আত্মহত্যা স্বীকার করিয়া যে পত্রখানি লিখিয়া গিয়াছিলেন, সেখানি তুমি সরাইয়া ফেলিয়াছিলে, তাহা মনে নাই? হয় সেখানি ফিরাইয়া দাও—নয় শ্রীঘরে লইয়া যাই চল। আমি তোমার কোন কথা শুনিতে চাই না। হয় দাও—নয় জেল খাট। পাঁচ মিনিট সময় দিলাম—যদি বাঁচিতে চাও, আর চাতুরী করিতে চেষ্টা করিও না।"

কমলিনী তখন আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে নিজ বস্ত্রমধ্য হইতে সেই কাগজখানি বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিল। আমি সেখানি হস্তগত করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলাম, "আর কিছু আছে, সুন্দরি! যে কাগজ তিনখানি তুমি হেমাঙ্গিনীর মাথার বালিশের নীচে হইতে চুরি করিয়াছিলে, তাহাও আমি চাই।"

আমার কথা শেষ হইতে-না-হইতেই কমলিনী তাহাও বাহির করিয়া দিল। আমারও "খুন না আত্মহত্যা" প্রমাণ করিবার সকল বস্তুই সংগৃহীত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিছুদিন পরে নিকলাস্ সাহেব ডগলাস্ সাহেবকে পত্র লিখিলেন ;—

"আমি আপনাকে এ পর্য্যন্ত যে কয়খানি পত্র লিখিয়াছি, তাহাতেই আপনি সমস্ত বিবরণ এক প্রকার জানিতে পারিয়াছেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু সম্মানের সহিত মুক্তি পাইয়াছেন। সহরের সকল সংবাদ-পত্রেই এখন খুব লেখালেখি চলিতেছে। কেবল একজন জুরীর জন্য এত বড় একজন উদারপ্রকৃতি, নিঃস্বার্থ পরোপকারী, স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ নির্দ্দোষ ব্যক্তি প্রাণ দান পাইলেন, দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা এখন হরিদাস গোয়েন্দা ও সেই একজন জুরীকে ধন্য ধন্য করিতেছে। হায়! এরূপ ঘটনা নিত্য ঘটিয়া থাকে, কিন্তু কয়জন লোকে পরের জন্য এত অর্থ ব্যয় করিতে অগ্রসর হয়? আপনার ন্যায় নিঃস্বার্থ পরোপকার কয়জন করিতে পারে? এরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কয়জন সাহস করে?

যজ্ঞেশ্বর বাবু এখন মনোরমার পিতামাতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই মনোরমার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। মনোরমা, যজ্ঞেশ্বর বাবু, মনোরমার পিতা, মাতা ও খুল্লতাত যিনি জুরীতে বসিয়াছিলেন এবং কেবল একমাত্র যাঁহার জন্য যজ্ঞেশ্বর বাবুর জীবন রক্ষা হইয়াছে এবং নবীন যতদূর সম্ভব সচ্চরিত্র হইয়া পিতার নিকট ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া দেশ ভ্রমণোদ্দেশে পশ্চিম যাত্রা করিয়াছে, পত্রের দ্বারা প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন অসম্ভব বিবেচনায় ইঁহারা সপরিবারে আপনাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য আগ্রায় উপস্থিত হইবেন।

হরিদাস গোয়েন্দাকে আপনার প্রেরিত পারিতোষিক প্রদান করিলাম। মনোরমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, খুল্লতাত, যজ্ঞেশ্বর বাবু এবং আমি, হরিদাস গোয়েন্দাকে যথাসাধ্য পুরস্কৃত করিয়াছি। সর্ব্বশুদ্ধ তিনি তেইশ্ হাজার টাকা পাইয়াছেন।

আমি হরতনের নওলার একখানি বৃহদাকার অয়েল পেন্টিং আঁকাইয়া তাহার উপর "যজ্ঞেশ্বর—মনোরমা" এবং নীচে "ডগলাস্—হরিদাস" লিখাইয়া লইয়া আমার নিজ বাটীর হলঘরের সম্মুখেই দেয়ালের গায়ে টাঙ্গাইয়া রাখিব। যখনি কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখনই আমায় এই সত্য ঘটনা বর্ণন করিতে হইবে। তাহা হইলেই ইহার প্রতি ঘটনা, প্রতি কথা, আজীবন আমার চিত্তে অঙ্কিত থাকিবে। হরতনের নওলা কাহিনী যার তার কাছে গল্প করিয়া আমি 'ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়!' এবং নিঃস্বার্থপ্রেমের জ্বলন্ত আদর্শ জনসাধারণে প্রচার করিতে পারিব। এ জীবনে ইহাই আমার সুখ—ইহাই আমার আনন্দ। আপনার নিঃস্বার্থ পরোপকার এ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।"

সমাপ্ত